ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana®
SAREES
Cotton Printed Sarees
Contact - 22188744/1386


# স্বস্তিকা

দাম ঃ ৪.০০ টাকা

৬২ বর্ষ ৪৮ সংখ্যা ।। ৯ শ্রাবণ ১৪১৭ সোমবার (যুগাব্দ - ৫১১২) ২৬ জুলাই, ২০১০ ।। Website : www.eswastika.com


আসবাব
বর্ধমান
(০৩৪২) ২৫৬৫৯৩১

## ডায়মণ্ডহারবারে মৌলবাদী সন্ত্রাস, প্রশাসন নীরব

সংবাদদাতা।। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে বিশেষ করে দক্ষিণ ২৪ পরগণার মতো সীমান্তবর্তী এলাকায় মুসলিম মৌলবাদী শক্তি যে সংগঠিত হচ্ছে তা প্রতিনিয়ত ঘটে যাওয়া ঘটনাপ্রবাহের দিকে নজর দিলেই বোঝা যাবে। কখনও বাসন্তী, কখনও সোনাখালি কিংবা মগরাহাট আবার কখনও বা ডায়মন্ডহারবার-এর মতো শহর এলাকাতেও যা হামেশাই ঘটে চলেছে।

গত রথের দিনে অর্থাৎ ১৩ জুলাই মঙ্গলবার ঘটে যাওয়া একটি ঘটনা ডায়মন্ডহারবার-কুলপি সংলগ্ন এলাকার হিন্দু সমাজের চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছে। ওই দিন ডায়মণ্ডহারবার-কাকদ্বীপ রোডের সংলগ্ন দলনঘাটা গ্রামে রথের মেলাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক সংখ্যায় লোক সমাগম হয়েছিল। বহুবছর ধরে এই মেলা স্থানীয় মানুষের মনকে উৎসব মুখর করে এসেছে। স্থানীয়

(এরপর ৪ পাতায়)

# বছরে ১০,০০০ কোটি টাকার গবাদি পশু পাচার

**নিজস্ব প্রতিনিধি।।** পরিসংখ্যানে চমকে ওঠার কিছু নেই। ভারতবর্ষের গ্রামীণ অর্থনীতি কিভাবে বছরের পর বছর ক্রমাগত পঙ্গু হয়ে পড়ছে তা শিরোনামের পরিসংখ্যানটিতে নিহিত থাকলেও তথ্যাভিজ্ঞ মহল একে 'মুক্ত গোপনীয়তা' (ওপেন সিক্রেট) ভিন্ন আর কোনও কিছুরই তকমা দিতে নারাজ। ৪০৯৬ কিলোমিটার দীর্ঘ ভারত বাংলাদেশ সীমারেখা বরাবর চলা গবাদি পশু পাচার ইদানীংকালে চরমতম আকার ধারণ করেছে বলে বি এস এফ-কে উদ্ধৃত করে সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে। এবছর বি এস এফ-এর গুলিতে এখনও পর্যন্ত ২৫ জন পাচারকারী গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। এদের মধ্যে ১৮ জন ভারতের নাগরিক, ৭ জন বাংলাদেশী। বি এস এফ সূত্রের বক্তব্য, ''দালালের সহযোগিতায় প্রতিমাসে অন্তত ১৫ হাজার গবাদি পশু, যার মধ্যে অধিকাংশ পশুই গোরু, ভারত থেকে বাংলাদেশে পাচার হয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশী কাস্টমস আধিকারিকদের প্রতিটা গবাদিপশু পাচারের জন্য অন্তত পাঁচশ টাকা করে দিচ্ছে এদেশের পাচারকারীরা। এছাড়া এইভাবে গবাদিপশুর পাচারের মোট অঙ্কটা বার্ষিক ১০,০০০ কোটি টাকায় পৌঁছে গিয়েছে।'' এক্ষেত্রে একটা জিনিস বেশ পরিষ্কার। ভারতবর্ষের মানুষের বার্ষিক ১০,০০০ কোটি টাকার সম্পত্তি চলে যাচ্ছে বাংলাদেশীদের হাতে এবং লক্ষণীয় হলো যে, বাংলাদেশ সীমা সংলগ্ন ভারতীয় গ্রামগুলোতেই এহেন ঘটনা ঘটছে। বি এস এফ সূত্র রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতার কারণে যা বলেনি তা হলো ব্যাপক অনুপ্রবেশের ধাক্কায় এবং সীমান্ত সংলগ্ন গ্রামগুলির এক শ্রেণীর মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষের ব্যাপক জুলুমবাজির জন্য হিন্দুরা প্রাণ ও মেয়েদের সম্ভ্রম বাঁচাতে সেখান থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হচ্ছেন। যে সুযোগের পূর্ণ ব্যবহার করছে অনুপ্রবেশকারী ও এদেশের নাগরিকত্ব পাওয়া মুসলমানরা। যে কারণে এখনও পর্যন্ত বি এস এফের গুলিতে গুলিবিদ্ধ হওয়া যতজন পাচারকারীর নাম সংবাদপত্রের সৌজন্যে গোচরে এসেছে তাদের সবাই মুসলমান।

যদিও বি এস এফের তাদের এই রিপোর্টের ওপর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে কিন্তু তারা যে এক্ষেত্রে 'নিধিরাম সর্দার' মাত্র সেটাও বুঝিয়ে দিয়েছে হাবে-ভাবে। তাদের বিভিন্ন সূত্রে বলা হয়েছে, ''ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকা এমনিতেই ভেসে গিয়েছে; সীমারেখার দুই-তৃতীয়াংশই নদীগর্ভে। শুধু তাই নয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গৃহস্থালির ঘর-বাড়ির খুব কাছ দিয়ে সীমারেখা গিয়েছে। এইসব কারণের জন্যই গবাদি পশুর পাচার একেবারে রোধ করা অসম্ভব।'' বি এস এফের যুক্তি, ''সেনাদের পক্ষে সম্ভব নয় সাঁতার কেটে পাচার হওয়া গবাদি পশু উদ্ধার করা। তার ওপরে নৌকা করেও গিয়ে যে উদ্ধার করবে সে উপায়ও নেই। কারণ জন্তুগুলো ভয় পেলে যে ঝাপটানি দেবে তাতে নৌকো উল্টে যাবার একটা সমূহ সম্ভাবনা থেকেই যায়।'' তাদের এই যুক্তির সমর্থনে সীমা-সুরক্ষা বাহিনীর মোক্ষম উদাহরণ—''গত বছর একজন বি এস এফ কনস্টেবল ভেসে যাওয়া পাচারকৃত একটা গবাদিপশু উদ্ধার করতে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়েন কিন্তু খরস্রোতা নদীর প্রবল

(এরপর ৪ পাতায়)

### পাচারের ইতিবৃত্ত

- গত মার্চে ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে চুক্তি সত্ত্বেও গবাদি পশু পাচার অব্যাহত। চলছে দু'পক্ষের গোলাবর্ষণও।
- প্রতিমাসে অন্তত ১৫ হাজার গবাদি পশু যার অধিকাংশই গরু পাচার হচ্ছে ভারত থেকে বাংলাদেশে।
- সুদূর হরিয়ানা, পাঞ্জাব, রাজস্থান এবং উত্তরপ্রদেশ থেকেও শ'য়ে শ'য়ে গবাদি পশু ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে পাচার হচ্ছে।
- পাচারকে কেন্দ্র করে বছরে বাণিজ্য চলে ১০০০০ কোটি টাকার।
- এ বছরে বি এস এফের হাতে নিহত পাচারকারীর সংখ্যা ২৫।

# পশ্চিমবঙ্গে উন্নয়ন স্তব্ধ : জেটলি

**নিজস্ব প্রতিনিধি।।** পশ্চিমবঙ্গে উন্নয়নের চাকাটা স্তব্ধ। অনুপ্রবেশ এবং মাওবাদী সন্ত্রাস এখানকার দুটি প্রধান সমস্যা। এই দুই সমস্যার মুখোমুখি এখনকার পশ্চিমবঙ্গের জনগণ। এভাবেই এরাজ্যের পরিস্থিতি নিয়ে সাংবাদিকদের কাছে মুখ খুললেন বিজেপি'র সর্বভারতীয় নেতা তথা রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা অরুণ জেটলি। রাজ্য বিজেপি আয়োজিত দু'দিনের (১৭-১৮ জুলাই) চিন্তন শিবিরে যোগ দিতে অরুণ জেটলিসহ আরও দুই বিজেপি নেতা— চন্দন মিত্র এবং মহিলা মোর্চার সর্বভারতীয় সভানেত্রী স্মৃতি ইরানীও এসেছিলেন। কলকাতার হরিয়ানা ভবনে দু'দিনের চিন্তন শিবিরের শেষে অরুণ জেটলি এবং চন্দন মিত্র সাংবাদিকদের সামনে বক্তব্য রাখেন এবং বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন। শ্রী জেটলি আরও বলেন, এসময় পশ্চিমবঙ্গে একটি দায়িত্বপূর্ণ সরকার দরকার রাজ্যের উন্নয়নের স্বার্থেই। যারা শুধু রাজনীতির জন্যই রাজনীতি করবে না। তিনি এদিন দলের পক্ষ থেকে জানিয়ে দেন যে, ১৯৯১ সালের মতোই বিজেপি আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যের ২৯৪ আসনেই প্রার্থী দেবে। জেটলির পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন বিজেপি নেতা চন্দন মিত্র। জ্ঞানেশ্বরী এক্সপ্রেসের দুর্ঘটনার প্রেক্ষিতে রেলমন্ত্রীর কড়া মন্তব্য না করার জন্য তিনি তীব্র সমালোচনা করেন।

আগামী আগস্ট থেকে রাজ্য বিজেপি নেতারা জেলা সফরে যাবেন বলে রাজ্য বিজেপি'র পক্ষ থেকে জানানো হচ্ছে।

কলকাতায় সাংবাদিক সম্মেলনে চন্দন মিত্র ও স্মৃতি ইরানী। সঙ্গে তথাগত রায় ও রাহুল সিন্‌হা।

# মমতা স্বীকার করুন বা না করুন রেলের নিরাপত্তায় চরম গাফিলতি

**গুঢ়পুরুষ।।** পশ্চিমবঙ্গে আবার ভয়াবহ রেল দুর্ঘটনা। ২৮ মে মুম্বাইগামী জ্ঞানেশ্বরী এক্সপ্রেসের পর ১৯ জুলাইয়ের ভোররাত্রে সাঁইথিয়ায় উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস একই লাইনে বনাঞ্চল এক্সপ্রেসের উপর আছড়ে পড়ে। সংঘর্ষে ঘটনাস্থলেই কমপক্ষে শতাধিক যাত্রী হতাহত হয়েছেন। রেলমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যথারীতি মৃত ও আহতদের পরিবারদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ঘোষণা করেই তাঁর দায় এড়িয়েছেন। জ্ঞানেশ্বরীর দুর্ঘটনার পর সি পি এমের উপর অন্তর্ঘাতের দায় চাপিয়ে এবং সি বি আই তদন্তের দাবি জানিয়ে রেল দুর্ঘটনাকে এক ধরনের রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র বলে চালিয়ে দেন রেলমন্ত্রী। পশ্চিমবঙ্গের কোথাও রেল দুর্ঘটনা ঘটলে 'দিদি' তখন সি পি এমের অদৃশ্য কালো হাত দেখেন। তাই ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করে তিনি রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের মোকাবিলায় ঝাঁপান। তাঁর দলের কর্মী সমর্থকরা গলাবাজি করেন 'দিদিকে' হেনস্থা করতেই সি পি এম রেল দুর্ঘটনা ঘটাচ্ছে।

কিন্তু এইভাবে নিজের ব্যর্থতার দায় অন্যের উপর চাপিয়ে দিয়ে নিজেকে ধোয়া তুলসীপাতা বলে চালানোর রাজনীতি একুশ শতকে যে অচল সে কথা রেলমন্ত্রীকে বুঝতে হবে। একই রেললাইনে দুটি দ্রুতগামী যাত্রীবাহী ট্রেন চলে আসাটা যে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র নয় বরং রেলকর্মীদেরই গাফিলতি সে কথাটা এখন স্কুলের ছাত্রছাত্রীরাও জানে। তারা নেট সার্চ করে জানিয়ে দেবে যে গত বছর মমতা রেল মন্ত্রকের দায়িত্ব নেওয়ার পর ২১ অক্টোবর, ২০০৯ গোয়া একস্‌প্রেস উত্তরপ্রদেশের মথুরা স্টেশনে একই লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা মেওয়ার এক্সপ্রেসকে পিছন থেকে ধাক্কা মারে। সংঘর্ষে ২১ জন যাত্রী মারা যান। এরপর চলতি ২০১০ সালের ২ জানুয়ারি উত্তরপ্রদেশে একই দিনে তিনটি বড় রেল দুর্ঘটনা ঘটে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই একই লাইনে দুটি ট্রেন চলে আসায় সংঘর্ষ হয়। যেমন, এটোয়া স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকা মগধ

এক্সপ্রেসকে পিছন থেকে ধাক্কা দেয় লিচ্ছবি এক্সপ্রেস। কানপুরের কাছে পানমি স্টেশনে একই লাইনে চলে আসায় গোরখধাম এবং প্রয়াগরাজ এক্সপ্রেসের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এরপর ১৬ জানুয়ারী আগ্রা থেকে ২৫ কি. মি. দূরে টুণ্ডলা স্টেশনে একই লাইনে চলে আসা কালিন্দি এক্সপ্রেস ও শ্রমশক্তি এক্সপ্রেসের সংঘর্ষ হয়। এইসব রেল দুর্ঘটনার সবই ঘটেছে পশ্চিমবঙ্গের বাইরে অন্য রাজ্যে। তাই এগুলিকে রাজনৈতিক অন্তর্ঘাত বলে চালিয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

একই লাইনে দুটি ট্রেনের চলে আসা এবং সংঘর্ষ হওয়া আধুনিক স্বয়ংক্রিয় সিগন্যালিং ব্যবস্থাতে সম্ভব নয়। দুটি ট্রেন একই লাইনে কাছাকাছি চলে এলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে লাল সঙ্কেত দেখা যাবে। সিগন্যালের দায়িত্বে থাকা কেবিনম্যানও

(এরপর ৪ পাতায়)

## সংবাদ-মাধ্যমের মিথ্যা ভাষণ ফাঁস

# মসজিদে বিস্ফোরণ নিয়ে আর এস এসকে জিজ্ঞাসাবাদ নয়: সি বি আই

**নিজস্ব প্রতিনিধি।।** সম্প্রতি সংবাদ মাধ্যমের একাংশ এক কাল্পনিক সংবাদ ছেপে সোরগোল করার চেষ্টা করেছিল যে, দুজন শীর্ষস্থানীয় আর এস এস কার্যকর্তাকে আজমীর এবং মক্কা মসজিদ-এ বিস্ফোরণ মামলায় জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। কিছু পত্রিকা তো কল্পনার বেলুন হাওয়ায় উড়িয়ে আরও একধাপ এগিয়ে গিয়ে লেখে— আর এস এস-এর এক সর্বভারতীয় নেতা ৬ জুলাই দিল্লীতে এই দায় থেকে অব্যাহতি পেতে বিজেপি নেতাদের ধরাধরি করছেন। ঘটা করে প্রচার হয়েছিল সঙ্ঘের দুই কর্মকর্তা অশোক বার্ষ্ণেয় এবং অশোক বেরী দুষ্কৃতীদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। এসবই সি বি আই-এর বক্তব্য বলে ছাপা হয়েছিল।

ঘটনা হলো—এবার স্বয়ং সি বি আই প্রধান অশ্বিনীকুমার গত ১৩ জুলাই সংবাদমাধ্যমকে জানিয়ে দেন— বিস্ফোরণ সংক্রান্ত মামলায় আর এস এস কার্যকর্তাদের সিবিআই-এর পক্ষ থেকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে বলে যে সব খবর ছাপা হয়েছে তা সবই ভিত্তিহীন এবং উদ্দেশ্যে প্রণোদিত। অশ্বিনীকুমারের কথাকে একটু অন্য ভাষায় বললে বলতে হয়— সংবাদমাধ্যমের একাংশ উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে জনগণকে ভাঁওতা দিতে ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল খবর খাওয়াতে চেয়েছিল। তবে বাজারী পত্রিকা সিবিআই ডিরেক্টরের কথাও ছোট করে ভিতরের পাতায় একেবারে একপাশে ছেপেছে। বলা বাহুল্য, ছাপাতে বাধ্য হয়েছে। লক্ষণীয়, বাজারীরা বাজার গরম করতে সিবিআই-এর মতো দেশের সর্বোচ্চ গোয়েন্দা সংস্থার নামও ব্যবহার করতে কসুর করেনি। উল্লেখ্য, যে সময়ে বিজেপির কাছে আর এস এসের সাহায্য চাওয়ার কথা বলা হয়েছে সেসময় যোধপুরে (৩/৪ জুলাই থেকে ৪/৫ দিন) আর এস এস-এর সকল শীর্ষস্থানীয় কার্যকতারা প্রতি বছরের মতো নিয়মমাফিক বৈঠকে মিলিত হয়েছিলেন। বিজেপি-র কাছে দরবার করার জন্য আর এস এসের কোনও সর্বভারতীয় শীর্ষ কার্যকর্তা রাজধানীতে উপস্থিত ছিলেন না। এদিকে গত ১০ জুলাই কলকাতায় বিজেপি'র মুখপাত্র ও সাংসদ তরুণ বিজয়কে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি সাফ জানিয়ে দেন, 'আর এস এস-এর পক্ষ থেকে বিজেপি-কে অনুরোধ করার কোনও প্রশ্নই ওঠে না।'

সি বি আই ডিরেক্টর অশ্বিনীকুমারও নর্থ ব্লকেই আর এস এস-এর প্রসঙ্গে রিপোর্টারদের জানিয়ে দেন—"No. Nobody was questioned by the CBI"।

এদিকে ভারতে যে সকল জেহাদি ও সন্ত্রাসী ঢুকে দেশজুড়ে সন্ত্রাস চালিয়ে গিয়েছে এবং চালাচ্ছে, তাদের আশ্রয়দাতাদের নামধাম নিয়ে কখনও কোনও চর্চা সংবাদমাধ্যমে দেখা যায় না। তারা কি হাওয়ায় অদৃশ্য হয়ে মিশে থাকে? ২৬/১১ হামলার আগে ব্যাপক পরিমাণে অস্ত্রশস্ত্র হাতবোমা, গুলি-কার্তুজ কোথায় জমা করে রাখা হয়েছিল? সীমান্ত পার করে জালনোট আমদানীকারীরা এবং জেহাদিরা কোথায় আশ্রয় প্রশ্রয় পাচ্ছে সেদিকে মিডিয়া নজর দিচ্ছে না। তাই সংবাদ মাধ্যমের একাংশ সম্পর্কে জনমনে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

এদিকে আর এস এস-এর কেন্দ্রীয় কার্যকরী মণ্ডলের সদস্য রামমাধব জানান, যদি সিবিআই তদন্তে নামে, তাহলে আর এস এস এর পক্ষ থেকে তদন্তে সবরকম সহযোগিতা করা হবে। আর যদি এর পেছনে আর এস এসকে বদনাম করার কোনও উদ্দেশ্য থাকে তবে তার মুখের মতো জবাব সঙ্ঘ দেবে।

সি বি আই ডিরেক্টরের মন্তব্যে কংগ্রেস বড় ধাক্কা খেলো বলে ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা। কেননা, নানাভাবে বেশ কিছুদিন ধরে 'হিন্দু সন্ত্রাসবাদ'-এর তত্ত্ব বাজারে খাওয়ানোর চেষ্টা চলছে।

# বসিরহাটে দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তার করেও ছেড়ে দিচ্ছে পুলিশ

**সংবাদদাতা।।** বসিরহাট মহকুমার, বাদুড়িয়া থানার 'সায়েস্তানগর' ও 'পূর্বজয়নগর' গ্রামে বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশ ও সন্ত্রাসে মদতকারী কিছু লোক স্থানীয় গ্রামবাসীদের ফসলের ক্ষতি করছে দীর্ঘদিন ধরে। গত ১৮ জুন ও তার পরবর্তী সময়ে বিভিন্নভাবে স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে সংঘর্ষ ও মারামারি হচ্ছে। প্রশাসনিকভাবে এস ডি পি ও এবং এস পি-কে জানানো হয়েছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি।

স্থানীয় ক্ষুদ্র ও মাঝারী চাষীদের অভিযোগ— দীর্ঘদিন ধরে তাদের চাষ করা ফসলের ক্ষতি করে চলেছে একদল সমাজবিরোধী। যারা বাংলাদেশের সঙ্গে গোরুর চোরা কারবার, উগ্রপন্থী পারাপার, বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র মজুত করার কাজে লিপ্ত।

গত ১৭ জুন রাতে রাতপ্রহরার সময় ৩টি গোরু আটক করে বর্তমান গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের সামনে হাজির করা হয়। কিছুক্ষণের মধ্যে ওই দুষ্কৃতীদের তিনজন গোরুর মালিক পরিচয় দিয়ে গোরু ফেরৎ পাওয়ার দাবি করলে তা অগ্রাহ্য করে গোরুগুলি বি.এস.এফ-এর হাতে দেওয়া হয়। পরের দিন অর্থাৎ ১৮ জুন সময় উক্ত চাষ মহলের মধ্যে পরিচিত পরিতোষ সরকারকে বাজার করতে যাওয়া মাত্রই ওই সমাজ বিরোধীরা ৮-১০ জন মিলে আটক করে অশালীন ভাষায় গালিগালাজ ও প্রচণ্ড মারধোর করতে করতে অপহরণ করে নিয়ে যায় এবং কিছুক্ষণের মধ্যে গোরুর ক্ষতিপূরণ বাবদ ৮০,০০০/ (আশি) হাজার টাকার দাবী করে ফোনে জানানো হয় পঞ্চায়েত প্রধানের কাছে।

এরপর একই রাতে ওই বাজারেই বাবলু মণ্ডলকে আটক করে অপহরণের চেষ্টা করে। অল্পসময়ের মধ্যে পরপর দুটো অপহরণের পরিকল্পনার ঘটনার আঁচ পেয়ে স্থানীয় চাষীরা বাদুড়িয়া থানায় ফোন করে।

থানার পুলিশ আসতে দেরী করায় বি এস এফ-কে ফোন করা হয়। বি এস এফ দ্রুত বাজারে এসে পরিস্থিতির সামাল দেয় এবং ওই সমাজবিরোধী দলের মূল পাণ্ডা আনুকে গ্রেপ্তার করে। কিছুক্ষণের মধ্যেই বি এস এফ-পুলিশের কাছে ধৃত আনুকে হস্তান্তর করে দেয়।

ঘটনা হলো, ওই ধৃত দুষ্কৃতীকে হাতে পেয়েও ৩০ মিনিটের মধ্যে পুলিশ ছেড়ে দেয়। স্থানীয় মানুষের দাবী— (১) বাদুড়িয়া থানার এই দ্বিচারিতার বিরুদ্ধে সঠিক ব্যবস্থা নিতে হবে। (২) সমাজবিরোধী দলের প্রত্যেককে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করে কঠোর আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

## এই সময়

### হিন্দুত্ব

দেশের জনসংখ্যা ২০ কোটি ২৪ লক্ষ। এর মধ্যে হিন্দু মাত্র দুই শতাংশ। দেশের নাম ইন্দোনেশিয়া। অধিবাসীরা অধিকাংশই মুসলিম কিন্তু সেখানকার স্থানের নাম, মানুষের নাম এমনকী প্রতিষ্ঠানের নাম সবেতেই সংস্কৃতের প্রভাব। ওই দেশে হিন্দুত্বের প্রয়াস তাঁর কাছে 'প্রভাবী' এবং 'বিস্ময়কর'। সম্প্রতি ইন্দোনেশিয়ায় আয়োজিত 'বিশ্ব সিন্ধি সম্মেলন' থেকে ফিরে এমনই উপলব্ধি ভারতের প্রাক্তন উপ-প্রধানমন্ত্রী লালকৃষ্ণ আদবানীর। গত ১৭ জুলাই নিজের ব্লগে এমনটাই জানিয়েছেন তিনি।

### মিলল মুক্তি

এগারো দিনের অসহ্য যন্ত্রণার অবসান। মৃত্যুর প্রহর গুণতে গুণতে মৃত্যুকেই যখন বিধাতার অনিবার্য লিখন বলে মনে মনে ভাবতে শুরু করেছিলেন ওড়িশা পুলিশের অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব ইনসপেকটর উমেশ মারান্ডি, তখনই মিলল মুক্তি। গত ৭ জুলাই রাতের বেলায় কেওনঝড় জেলায় দইতারি থানা থেকে মাওবাদীদের হাতে অপহৃত হন তিনি। এরপর মারান্ডি পরিবারের তরফ থেকে মাওবাদীদের উদ্দেশ্যে চলে উপরোধ অনুরোধ। কিন্তু তাতে কান না দেওয়া মাওবাদীরা যখন বুঝতে পারে জনমত ক্রমশ তাদের বিরুদ্ধে চলে যাচ্ছে তখন প্রায় এগারো দিন পরে গত ১৭ তারিখ মুক্তিপণ ছাড়াই একপ্রকার নিঃশর্তে মুক্তি জোটে মারান্ডির। ক'টা পুলিশের এই সৌভাগ্য হয়?

### অহো! কী নিমন্ত্রণ

ভারতের রাষ্ট্রপতি প্রতিভা পাতিল এই নভেম্বরেই ভারতের মাটিতে স্বাগত জানাতে চলেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক হুসেন ওবামা-কে। স্বাগত জানানোর কায়দাটি অতীব কৌতূহলোদ্দীপক। চাল, তিল এবং সরষের তেলের মাধ্যমে আত্মজীবনীমূলক একটি পুস্তক শ্রীমতি পাতিল তুলে দিতে চাইছেন ওবামার হাতে। পাতিলের অনুরোধে ঔরঙ্গাবাদ নিবাসী জনৈক শিল্পী ও তৈলবীজ বিশেষজ্ঞ এস. ওয়াধঙ্কার এনিয়ে একটি স্মারকগ্রন্থ সম্পাদনা করছেন। হঠাৎ এহেন পরিকল্পনা কেন? উত্তরে ওয়াধঙ্কার যা জানালেন তা যেমন বিস্ময়কর, তেমনি মজার। তাঁর বক্তব্য— "আসলে শ্রীমতি পাতিল তৈলবীজের শিল্পকলাকে ভিন্ন আঙ্গিকে মর্যাদা দিয়ে ওবামার হাতে স্বয়ং ওবামারই আত্মজীবনী তুলে দিতে চাইছেন।"

### রক্ষাকবচ ৯

নাগরিকদের 'মত প্রকাশের স্বাধীনতা'কে সুরক্ষিত করবার জন্য এবং কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার যাতে সংবাদপত্র বা বই-প্রকাশের অধিকারকে খর্ব করতে এ-সংক্রান্ত আইনের অপব্যবহার না করতে পারে, তা সুনিশ্চিত করার জন্যই ন'টি 'গাইডলাইন' জারি করল সুপ্রিম কোর্ট। ইন্ডিয়ান পিনাল কোডের ১৫৩ ও ১৫৩-এ ধারা অনুযায়ী সরকারের পূর্ণ অধিকার রয়েছে কোনও প্রকাশনা-কে নিষিদ্ধ বা 'ব্যান' করবার। কারণটি যুক্তিগ্রাহ্য না হলেও আইনের হাত-পা এক্ষেত্রে বাঁধা ছিল এতদিন। সুপ্রিম কোর্টের সাম্প্রতিকতম রায়ে সেই হাত-পায়ের বাঁধন কিছুটা খুলল বটে তবে 'মত প্রকাশের স্বাধীনতা'র ভাগ্যে পূর্ণ-স্বাধীনতা জুটবে কিনা তা সময়-ই বলবে।

### পুনঃ প্রতিষ্ঠিত পাক-শয়তানী

২৬/১১-র মুম্বই হামলার অন্যতম অভিযুক্ত তথা পাকিস্তানী বংশোদ্ভূত মার্কিন নাগরিক লস্কর-এ-তৈবার নেতা ডেভিড কোলেম্যান হেডলির ঝুলি থেকে বেরিয়ে পড়ল একটি মোক্ষম বেড়াল যা কুরেশী পরবর্তী পরিস্থিতিতে পাক অস্বস্তি আরও বাড়িয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। ভারতীয় গোয়েন্দাদের হেডলি জানিয়েছে, মুম্বই হামলায় অংশগ্রহণকারী অন্তত দশজন হামলাকারী পাকিস্তানের নৌ-বাহিনীর কাছে এ-সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ নিয়েছিল। মুম্বই হামলাকে সুচারুভাবে সম্পন্ন করবার জন্য যে পাক নৌ-বাহিনীর চেষ্টায় কোনও খামতি ছিল না তা আজমল কাসভ বহু আগেই জানিয়েছিল ভারতকে। হেডলি-র স্বীকারোক্তি সেই সত্যকেই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করল।

### সাংসদের পৌষমাস, দশের...

সাংসদ বলে কি মানুষ নয় নাকি মশাই? কি বিশ্রি ব্যাপার। কারা যেন রটিয়ে দিয়েছিল সাংসদ (রাজ্যসভা ও লোকসভা উভয় ক্ষেত্রেই) পদে থেকে 'প্রাইভেট সেক্টর'-এ চাকরি করা যাবে না, করলে নাকি সদস্যপদ খোয়াতে হবে। তবে সব সংশয় থেকে মুক্তি দিয়ে গত ২১ জুন সংসদ বিষয়ক কমিটি জানিয়ে দিল, সংসদের সদস্যরা 'প্রাইভেট সেক্টর'-এ কাজের সঙ্গে যুক্ত থেকে আয় করলেও তা 'প্রফিট রুলস'-কে কোনও মতেই বিঘ্নিত করছে না। প্রসঙ্গত, রাজ্যসভার সদস্য ও অর্থনীতিবিদ অর্জুন সরকার সম্প্রতি মাসিক চার লক্ষ টাকার বিনিময়ে ও পি জিন্দাল গ্লোবাল ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপনার কাজে যুক্ত হয়েছেন। সেই পরিপ্রেক্ষিতেই প্রশ্ন উঠে আসে— 'সাংসদদের প্রাইভেট সেক্টরে কাজ করে উপার্জন করা কতটা আইনসঙ্গত।' সংসদীয় কমিটির ঘোষণায় সাংসদরা উপকৃত হলেন নিশ্চয়ই, তবে দেশ ও দেশবাসী এর দ্বারা কতটা উপকৃত হবেন না কি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন, তা অবশ্যই বিবেচনার দাবী রাখে।

### সোনিয়াকে সমন

কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধীকে অবশেষে সমন ধরালো বিহার হাইকোর্ট। ধর্মীয় সেন্টিমেন্টকে আঘাত করার অপরাধে ২৯ জুলাইয়ের মধ্যে তাঁকে হাজিরা দিতে হবে আদালতে। প্রসঙ্গত, ২০০৭-এর ২২ জুন মুজফফরপুর আদালতে জনৈক সুধীর কুমার ওঝা একটি জনস্বার্থের মামলা দায়ের করেন। তিনি সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপনের জন্য প্রচারিত এবং কংগ্রেসের মুজফফরবাদের কার্যালয়ের দেওয়ালে সোনিয়াকে দেবী দুর্গার আদলে সাজানো একটি পোস্টারের উপস্থাপন করেন আদালতে। সেই প্রেক্ষিতেই আদালতের ওই রায়। সোনিয়ার সঙ্গে উত্তরপ্রদেশের কংগ্রেস সভানেত্রী রীতা বহুগুণা এবং মোরাদাবাদ জেলা কংগ্রেস সভাপতি অজয় তারকেশ্বর সোনি-কেও সমন ধরিয়েছে আদালত

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

# সম্পাদকীয়

## ভারত আর কতবার পাকিস্তানের হাতে অপদস্থ হইবে?

সম্প্রতি ভারত-পাক শান্তি আলোচনা বসিয়াছিল পাকিস্তানে। মুখোমুখি বসিয়াছিল দুই দেশের দুই বিদেশমন্ত্রী। ভারতের বিদেশমন্ত্রী শ্রী এস এম কৃষ্ণ এবং পাকিস্তানের বিদেশমন্ত্রী মেহমুদ কুরেশী। দুই বিদেশমন্ত্রীর শান্তি আলোচনার পরিণতি কি হইয়াছে আধুনিক সংবাদমাধ্যমগুলির কল্যাণে এদেশের মানুষ তাহা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জানিয়া গিয়াছে। তবে তাহাতে এদেশের শান্তিকামী মানুষ যে খুব একটা আশ্চর্য হইয়াছে তাহা নহে। কারণ দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে দেশভাগ হইয়াছিল—এই ভাবনার দ্বারা পরিচালিত হইয়াই পাকিস্তান ভারতকে হিন্দুস্থান বলিয়া থাকে। অতএব স্বাভাবিক কারণেই পাকিস্তান ভারতের সঙ্গে যে কোনও ইভেন্টকেই হিন্দু-মুসলমান যুদ্ধ হিসাবেই ধরিতে অভ্যস্ত। সে খেলার মাঠেই হউক; কিংবা রাজনীতির মাঠে, সেখানে একদল সবসময়েই 'যুদ্ধং দেহি' মনোভাব লইয়া চলিয়া থাকে, সেখানে আর একদল যদি ছাগ শিশুর মতো নিরীহ আচরণ করিয়া থাকে, তাহা হইলে যাহা স্বাভাবিক তাহাই হইয়াছে। দেশের অসংখ্য অশিক্ষিত ধর্মীয় গোঁড়া ও প্রচণ্ড হিন্দুবিদ্বেষী জনগণকে তুষ্ট করিবার দায়িত্ব পাক নেতাদের সব সময়েই থাকে। কুরেশীরও আছে। তিনি তাহাই করিয়াছেন।

শোনা যায়, কুরেশী না কি বারবারই সভা ছাড়িয়া কোথায় যেন চলিয়া যাইতেছিলেন। দেশে আমন্ত্রিত ভিন্ন দেশের বিদেশমন্ত্রী এস এম কৃষ্ণকে একা একা সভামঞ্চে বসাইয়া রাখিয়া চলিয়া যাওয়া— এমনই অসভ্য আচরণ পাকিস্তানের বিদেশমন্ত্রী ভারতের বিদেশমন্ত্রীর প্রতি করিয়াছিলেন। ইহার জন্য তিনি অনুতপ্ত তো নন-ই বরং জনসমক্ষে তিনি বলিয়াছেন যে "আমরা (পাকিস্তান) এই আলোচনার জন্য ভারতের কাছে হাঁটু গাড়িয়া বসি নাই, ভারতই আমাদের কাছে আসিয়াছে।"

কি অপমানজনক কথা! তাহা বুঝিবার মতো আত্মসম্মানবোধ কংগ্রেসী প্রধানমন্ত্রীর আছে কি? কংগ্রেসের অন্তরাত্মাতো এক বিদেশিনী, তাহার মনে এদেশের জন্য সম্মানবোধ না থাকাটাই স্বাভাবিক। একজন জন্মসূত্রে ভারতবাসী প্রধানমন্ত্রীর মনে দেশের জন্য স্বাজাত্যাভিমানজনিত সম্মানবোধ না থাকাটা যেমন খুবই দুঃখের, তেমনই বিস্ময়েরই। এতসব ঘটনা সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রী বলিয়া চলিয়াছেন যে ভারত আলোচনার পথ প্রশস্তই রাখিয়া চলিবে। ইহাতেই মোক্ষ লাভ। ভারতবাসী মাত্রই জানেন যে পাকিস্তানের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে শান্তি কখনই সম্ভব নয়। কিন্তু কংগ্রেসীরা কেন জানি না ফুল্লরার বারমাস্যার ন্যায় 'তিন হাঁটু' এক না করিয়া থাকিতে পারে না। ফুল্লরা ছিল নিদারুণ দারিদ্র্যপীড়িত, কংগ্রেসীরা কি বিদেশী প্রভু পীড়িত? ভারতের কংগ্রেস সরকারের পাক-প্রীতির পিছনে যেন রহিয়াছে এক বিদেশী প্রভুর রক্তচক্ষু।

কুরেশীর মন্তব্য ছিল সমস্ত আন্তর্জাতিক শিষ্টাচার নীতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী। তিনি ভারতের স্বরাষ্ট্র সচিব জি. কে. পিল্লাইয়ের সংবাদপত্রে দেওয়া এক মন্তব্যকে কুখ্যাত পাক সন্ত্রাসবাদী হাফিজ মহম্মদ সাঈদের ভারতের বিরুদ্ধে করা ঘৃণাপূর্ণ বক্তব্যের মিল তুলিয়া শান্তি আলোচনার পরিবেশকে অশান্ত করিয়া তুলিয়াছেন। মুম্বাই কাণ্ডে জড়িত পাক-মদতপুষ্ট সন্ত্রাসবাদীদের প্রশ্ন যেন না উঠিতে পারে তাহারই সুস্পষ্ট প্রচেষ্টা করিয়াছেন।

ভারতের বিদেশমন্ত্রী যে পূর্ণ প্রস্তুতি ছাড়াই পাকিস্তানে গিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার আচরণেই স্পষ্ট। তাঁহার আচরণে দৃঢ়তা একেবারেই নাই। তিনি দোষারোপ করিয়াছেন তাহার সরকার ও দলের নেতৃবৃন্দকে। তিনি ভারতের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিলেন। ইদানিং মনমোহন সিং সরকারের এক মন্ত্রীর সহিত আর এক মন্ত্রীর খেয়োখেয়ি প্রকাশ্যেই আসিয়া পড়িয়াছে। অথচ প্রধান বিরোধী দল হিসাবে বিজেপির ইউ.পি.এ সরকারের এই অবস্থার সুযোগ লইতে যে তৎপরতা দেখানোর প্রয়োজন ছিল তাহা লক্ষ্য করা যাইতেছে না।

## জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

*হিন্দুরাষ্ট্রের তত্ত্বটা ধর্মনিরপেক্ষতার বিরোধী এরকম একটা যুক্তির বারংবার পুনরুল্লেখ বিরক্তিকর। প্রথমত, ধর্মনিরপেক্ষ ধারণাটার জন্মস্থান পাশ্চাত্যভূমি, আমাদের দেশের মাটির সঙ্গে তার কোনও সঙ্গতি বা সংযোগই নেই। কয়েক শতাব্দী পূর্বে ইউরোপীয় কতিপয় রাজতন্ত্র তাঁদের রাজত্বের ওপর পোপের পুরোহিততান্ত্রিক আধিপত্যরোধে তৎপর হন এবং তার উৎখাত ঘটিয়ে স্বীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। এইভাবেই পুরোহিততান্ত্রিক রাষ্ট্রবিরোধী হিসাবে 'ধর্ম-নিরপেক্ষ' (সেকুলার) রাষ্ট্রতন্ত্রের আত্মপ্রকাশ ঘটে। পরবর্তীকালে পুরোহিততান্ত্রিক রাষ্ট্রের অর্থ দাঁড় করানো হয়েছে— অপরাপর সব ধর্মবিশ্বাসের প্রতি অসহিষ্ণু এক ধর্মীয় রাষ্ট্র। আমাদের দেশে এ ধরনের বিরোধী বা অসহিষ্ণুতার কোনও অবকাশ অতীতে কোনওদিন ছিল না, আজও নেই।*

*এতদ্ব্যতীত 'ধর্মনিরপেক্ষ' কথাটি আমাদের সংবিধানে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। আমাদের দেশের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি কে. সুব্বারাও ইতিপূর্বে বিষয়টির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। কথাটি আমাদের সংবিধানের ওপর চাপানোর চেষ্টা করলে তা নেহাৎ অবান্তর বলে গণ্য হতে পারে।*

*—শ্রী গুরুজী*

# বারুদের স্তূপের ওপর পশ্চিমবঙ্গ

**জগন্নাথ মুখোপাধ্যায়**

আজ আর কারো অজানা নেই যে, মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির অভাবে এবং জহরলাল নেহরুর ক্ষমতা লাভের লালসায় ধর্মের নামে দ্বিজাতি তত্ত্বের বায়বীয় ভিত্তিতে ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত হয়। মাঝখানে ভারত আর পূবে-পশ্চিমে পাকিস্তান। ভাগ-বখরার সময় বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ এবং অসমও প্রায় পূর্ব-পাকিস্তানের অঙ্গীভূত হতে চলেছিল। পিতৃপুরুষের ভাগ্যে পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুরা যাদেরকে 'ঘটি' বলা হয় এবং অসমবাসীরা পাকিস্তানের ভাগে শেষপর্যন্ত পড়েনি 'বাংলার বাঘ'-এর সুসন্তান শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ঐকান্তিক প্রয়াসে। প্রসঙ্গত বলা যায়, পাকিস্তান প্রাপ্তির পরে জিন্না বলেছিলেন, তিনি নাকি পোকায় খাওয়া পাকিস্তান পেয়েছেন। তাহলে তো বলতেই পারি, আমরা পোকায় খাওয়া পশ্চিমবঙ্গ পেয়েছি, যার ভৌগোলিক পরিচয়ে পূর্ব আর পশ্চিম নেই। কেবল আছে উত্তরবঙ্গ আর দক্ষিণবঙ্গ। যাইহোক, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যটির পরিসীমা কিভাবে চুলচেরা বিচারে তৈরি হয়েছে জানার জন্য একবার পশ্চিমবঙ্গের ম্যাপটার দিকে আগ্রহী পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

যদি ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর মাপকাঠিতেই ভারতবর্ষ ভাগ হয়ে থাকে তাহলে সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের পশ্চিম ও উত্তরদিকের বেশ কয়েকটি জেলার ভারতে (পশ্চিমবঙ্গে) থাকার কথা। কিন্তু উজির-এ-আজম জওহরলালের তখন সবুর আর সইছে না। রাজকন্যা তো হাতের মুঠোয়, এখন রাজ্য (এখানে খন্ডিত ভারত) পেলেই ষোলকলা পূর্ণ। বাঙালি এবং পাঞ্জাবীরা (হিন্দু-শিখ) গৃহচ্যুত, ধর্মচ্যুত, ধর্ষিত, বঞ্চিত, লাঞ্ছিত এবং বিতাড়িত যাই হোক না কেন, জওহরলালের গদি চাই। একেই বলে, কারো সর্বনাশ কারো পৌষমাস। কয়েক কোটি বাঙালি হিন্দু, যাঁরা হাজার হাজার বছর ধরে ৩০/৪০ পুরুষানুক্রমে বঙ্গ দেশের অধিবাসী তাঁরা স্বাধীনতার নামে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে রাতারাতি 'নিজভূমে পরবাসী' হয়ে গেলেন। ১৯৪৭-এর ১৪ আগস্ট নবলব্ধ স্বাধীনতায় বাংলার বড় অংশটাই হয়ে গেছে পূর্ব পাকিস্তান— মুসলমানদের দেশ। এখানে হিন্দু বৌদ্ধ ক্রিশ্চানেরা ব্রাত্য— কাফের। অতএব তাদের উপর যে কোনও রকম অত্যাচার উৎপীড়ন করা যায়। হয়েছিলও তাই। খাস কলকাতায় যদি 'গ্রেটেস্ট হিন্দু কিলিং—আধুনিক ভাষায় যাকে আমরা 'এথনিক ক্লিন্‌সিং' বলি, এ আর এখন বেশি কথা কি? কিন্তু শুধু কিলিং নয়, মেয়েদের রেপিং না করলে ওদিকে মাদানি আয়াতের যে বরখেলাপ হয়।

এদিকে ১৯৪৬/৪৭ সাল থেকেই নিরন্তরভাবে হিন্দু নির্যাতন এবং বিতাড়ন চলছে। আক্রমণকারী এবং আক্রান্তেরা জানে যে, আশ্রয়স্থল হিসাবে ভারত আছে। অতএব উদ্বাস্তুর ঢল নামল। এই উদ্বাস্তুরা একদিন পূর্ববঙ্গে ধনে-মানে শিক্ষা-দীক্ষায় বেশ উল্লেখযোগ্য ছিলেন। কিন্তু প্রাক্ স্বাধীনতাকালে মুসলিম লীগের উত্থানপর্ব থেকেই সেখানকার হিন্দুদের কপাল ভাঙতে থাকে। কিন্তু কেন? এর তো একটা সামাজিক অর্থনৈতিক ধর্মনৈতিক, সর্বোপরি রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটও থাকবে। অন্তত থাকা উচিত। আমারও মনে হয়, এক্ষেত্রে সার্বিকভাবে সে রকম কোনও পর্যবেক্ষণ পর্যালোচনা বা ক্ষেত্র সমীক্ষা হয়নি। এইভাবেই আরো ১৮টা বছর কাটল। ইতিমধ্যে বিশ্বরাজনীতিতে বিরাট পরিবর্তন এসেছে। পৃথিবী দুই সুপার পাওয়ারের আকচাআকচিতে পড়ে গেছে। আর তথাকথিত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, না হয় সোভিয়েত রাশিয়ার ছত্রছায়ায় আশ্রয় নিচ্ছে। ইতিমধ্যে কাশ্মীরের দখলদারি নিয়ে ১৯৬৫-তে আরও একপ্রস্থ ভারত-পাক যুদ্ধ হয়ে গেছে। এবং এবারেও যথারীতি পাকিস্তানের পরাজয়। এবং এবারেও ঝালটা গিয়ে পড়ল পূর্ব-পাকিস্তানের হিন্দুদের উপর। কারণ, এরাই হলো ধর্মান্ধদের সফ্‌ট্ টার্গেট— সহজ শিকার। কাজেই আর একপ্রস্থ মানহারা, সর্বহারা বিতাড়িত হিন্দুদের (বাঙালি) ভারতে আগমন। এই যে বারে বারে হিন্দুরা এসে পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নিচ্ছে কিন্তু তার বদলে তো এখানকার মুসলিমরা বিতাড়িত, উপদ্রুত হয়ে পাকিস্তানে ফিরে যাচ্ছে না। যায়ওনি। কিন্তু জমি তো রবার নয়, যে টানলেই বাড়বে। উদ্বাস্তুরা প্রথম দিকে পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব-সীমান্তবর্তী অঞ্চলে, জেলায় জেলায় জলাজমি, পতিত জমি, খাস জমিতে দরমার বেড়া দিয়ে (সবাই নয়) বসবাস করতে থাকল। কিন্তু এইসব অঞ্চল লগুলিও ক্রমশ পূর্ব পাকিস্তানাগত মুসলিম অধ্যুষিত হয়ে উঠল। দু'দেশের কোনও সুস্পষ্ট সীমারেখা নেই, বেড়া নেই, যাতায়াতের বিধিনিষেধ নেই। কাজেই বারংবার মার-খাওয়া নির্যাতিত হিন্দুরা বাংলার সীমান্তবর্তী অঞ্চলে ছেড়ে প্রাণের তাগিদেই কলকাতার উপকণ্ঠে শহরতলিতে এমন কী অপেক্ষাকৃত নিরাপদ ভেবে হাওড়া হুগলি বর্ধমান বীরভূম মেদিনীপুর বাঁকুড়া জেলায় গিয়ে আশ্রয় নিল।

বাংলাদেশের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের সীমানা ২২১৬.৭ কিমি। এর মধ্যে স্থলভূমি যেমন আছে, তেমনি নদীনালা বাঁওড় খাল বিলও আছে। কোথাও কোথাও তো একই গ্রামের এক অংশ ভারতে, আরেক অংশ বাংলাদেশে। কাজেই এ হেন জটিল সীমান্ত রেখায় কাঁটাতারের বেড়া, সীমান্তপ্রহরা নিছক তামাশা। তাছাড়া ভারতের সীমা সুরক্ষা বল-এর মধ্যেও অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি লক্ষ্য করা যায়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কথা বাদ দিল, ভারত সরকারও কখনও এই সমস্যার প্রতি যথোপযুক্ত নজর দেয়নি। আজ যখন গোয়েন্দা দপ্তর জানাচ্ছে যে, কলকাতা শিলিগুড়ি মুর্শিদাবাদ মালদা হয়ে হুজি, সিমি, লস্কর-এ-তৈবা, আল-কায়দা, আল বদর, মুজাহিদিন প্রভৃতি সন্ত্রাসী সংগঠনের ফিদাইন গোষ্ঠীর উগ্র ধর্মান্ধ মানুষেরা গোটা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছে এবং নিরন্তর আসছে, তখন বিলম্বে হলেও ভারত সরকারের একটু যেন টনক নড়েছে। কিন্তু এ অনুপ্রবেশের সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো সীমান্তবর্তী অঞ্চলের জনবিন্যাসের চরিত্র। এইসব অঞ্চলে সংখ্যাগুরু মুসলিমেরাই (যদিও সবাই নন) বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের আশ্রয়দাতা। সব মুসলিম আতঙ্কবাদী নয়, উগ্রবাদীও নয়। কিন্তু এটাও সত্য যে, তাদের একটা বড় অংশই ভারতে, বিশেষত পশ্চিমবঙ্গে সার্বিক, সামাজিক সমস্যা সৃষ্টির মূলে। প্রত্যয় না হয়, হলফ করে বলা যায়, গত দশ বছরের সংবাদপত্রে চোখ রাখলেই এই বক্তব্যের সমর্থন পাবেন।

> **"অনুপ্রবেশের সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো সীমান্তবর্তী অঞ্চলের জনবিন্যাসের চরিত্র। এইসব অঞ্চলে সংখ্যাগুরু মুসলিমেরাই (যদিও সবাই নন) বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের আশ্রয়দাতা। সব মুসলিম আতঙ্কবাদী নয়, উগ্রবাদীও নয়। কিন্তু এটাও সত্য যে, তাদের একটা বড় অংশই ভারতে, বিশেষত পশ্চিমবঙ্গে সার্বিক, সামাজিক সমস্যা সৃষ্টির মূলে।"**

আমাদের বাঙালিদের (বিশেষ হিন্দুদের) জেগে ঘুমোবার অভ্যাস মজ্জাগত। কোণঠাসা হতে হতে আমাদের শেষ আশ্রয়স্থল এই ছোট রাজ্য পশ্চিমবাংলা। (কুতার্কিক বাঙালির কথা মনে রেখেই বলছি, আমি ত্রিপুরার কথা ধর্তব্যের মধ্যে ধরছি না।) এখন বাংলাদেশ থেকে পশ্চিমবাংলায় ঢুকতে পারলেই অতি সহজে ভারতীয় নাগরিকত্ব, রেশন কার্ড, পঞ্চায়েত প্রধানের শংসাপত্র এমন কী একজন/দুজন জীবনসঙ্গিনীও পাওয়া যায়। আর তারপর গোটা ভারতে চারিয়ে যাওয়ার ছাড়পত্র। বিগত কয়েক বছরে দিল্লি, মুম্বাই, পুনে, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশে ঝাঁকে ঝাঁকে বাংলাদেশী ধরা পড়েছে। সেখান থেকে পুশ্‌ব্যাক করলে এরাজ্যের এক অগ্রগামী রাজনৈতিক দল উলুবেড়িয়া স্টেশনে মড়াকান্না কেঁদে ধুন্ধুমার কাণ্ড বাধায়। তেনারা হঠাৎ উলুবেড়িয়া রেল স্টেশনটিকে কেন বেছে নিয়েছিলেন, তা যাঁরা ওই অঞ্চলের জলবিন্যাসের খবর রাখেন তাঁরা সহজেই বুঝতে পারবেন। আর পশ্চিমবাংলার এই খোলা দরজা দিয়েই চলে আসছে কোটি কোটি টাকার জাল নোট, আর ডি এক্স জাতীয় বিস্ফোরক দ্রব্য।

এই অন্তহীন অনুপ্রবেশের ফলেই এ রাজ্যের ধর্মীয় জাতিগত জনবিন্যাসের এক ভয়ংকর ছবি ফুটে উঠছে। বাংলাদেশে হিন্দুরা ক্রম ক্ষীয়মান। আর এখানে প্রায় সব জেলায় মুসলমান জনসংখ্যার হার অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে চলেছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এইভাবে বাড়তে থাকলে অদূর ভবিষ্যতে বাঙালি হিন্দুদের কপালে অনেক দুর্ভোগ আছে। দেশের কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার, রাজনৈতিক নেতাগণ এবং সর্বোপরি এখানকার জনগণ যদি এ বিষয়ে সচেতন না হয় তাহলে কিন্তু বাংলার ভারতীয় (বিশেষ করে হিন্দু) নাগরিকদের ভাগ্যে অশেষ দুর্গতি অপেক্ষা করছে। সেদিন কিন্তু দুর্গতিনাশিনী দুর্গা দশপ্রহরণ ধারণ করে তাঁর অবোধ সন্তানদের রক্ষা করতে এগিয়ে আসবেন না। ইতিহাসও তাই বলে। কারণ, আত্মরক্ষাটা শেষপর্যন্ত নিজেকেই করতে হয়।

# রেলের নিরাপত্তায় চরম গাফিলতি

*(১ পাতার পর)*

জানতে পারবেন যে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্রেনের খুব কাছেই অন্য একটি ট্রেন চলে এসেছে। কেবিন থেকেও লাল সঙ্কেত দেওয়া হবে। সতর্কতার ও নিরাপত্তার সবরকম ব্যবস্থাই নেওয়ার দায়িত্ব তখন কেবিনম্যানের। কাগজে কলমে রেল চলাচলের যে নিরাপত্তা ব্যবস্থা বহাল আছে তাতে এমন দুর্ঘটনা হওয়ার কথাই নয়। একমাত্র নিরাপত্তার ব্যাপারে চরম গাফিলতির জন্যই সাঁইথিয়া বা অন্যত্র এমন দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। মমতা স্বীকার করুন বা নাই করুন একটি সত্য স্পষ্ট যে রেলের মতো একটি বিশাল মন্ত্রকের কাজ চালাতে যে সময় দেওয়ার দরকার তা তিনি দেন না। কারণ, মমতার চোখ এখন পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার নির্বাচনের উপর। তাই প্রতি সপ্তাহে তিনি এই রাজ্যে কোনও না কোনও রেল প্রকল্পের শিলান্যাস করছেন। তা করছেন করুন। কিন্তু যাত্রীদের নিরাপদে রেলযাত্রার দায়িত্বও যে তাঁর মন্ত্রকের সেই কথাটি বেবাক ভুলে গেলে চলবে কী করে? রেলযাত্রীদের কাটা মুণ্ডের বিনিময়ে কিছু টাকা দিয়ে দেওয়াটা যে নিছক নিষ্ঠুরতা—সে কথাটি রেলমন্ত্রী যত তাড়াতাড়ি বোঝেন ততই মঙ্গল। তা' ছাড়া তাঁর প্রশাসন পরিচালনার যোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। রেল চালাতে ব্যর্থ মন্ত্রী কীভাবে ভবিষ্যতে রাজ্য প্রশাসনের হাল ধরবেন সেই বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন উঠবে। জ্ঞানেশ্বরী দুর্ঘটনার পরে দাবি জানানো হয়েছিল যে মমতা 'শ্বেতপত্র' প্রকাশ করে জানান কোথাও কোনও গাফিলতি থাকলে দোষীদের কী শাস্তি দেওয়া হয়েছে। মমতা সে পথে না হেঁটে দুর্ঘটনাকে রাজনৈতিক অন্তর্ঘাত বলে তাঁর মন্ত্রককে আড়াল করেছিলেন। এখন দেখার সাঁইথিয়ার দুর্ঘটনাকে তিনি কীভাবে ব্যাখ্যা করেন।

## সংশোধনী

১। ৫ জুলাই শ্যামাপ্রসাদ সংখ্যায় 'আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে' প্রবন্ধে দুর্গাপ্রসাদের বিবাহের স্থান 'হাওড়া' গ্রামের পরিবর্তে 'হোয়েরা' গ্রাম পড়তে হবে।

২। গত ১২ জুলাই সংখ্যায় 'কলকাতা হাইকোর্টের রায়' শীর্ষক সংবাদে মামলাকারী হিসেবে কৃশানু মিত্রের নাম অনবধানবশত অনুল্লেখিত থেকে গিয়েছে। এজন্য দুঃখিত।

৩। গত ১২ জুলাই সংখ্যার শেষপাতায় 'তৃণমূলের নারকীয় তাণ্ডব বিদ্যার্থী পরিষদের ওপর' শীর্ষক সংবাদ ঘটনার তারিখ ২৯ জুলাই-এর পরিবর্তে ২৯ জুন পড়তে হবে।

## শোক-সংবাদ

গত ৭ জুলাই টালিগঞ্জ প্রভাত শাখার প্রাক্তন কার্যবাহ শশাঙ্ক শেখর চৌধুরী সজ্ঞানে সাধনোচিত ধামে গমন করেছেন।

# গবাদি পশু পাচার

*(১ পাতার পর)*

স্রোতে টাল সামলাতে না পেরে তাঁর মৃত্যু হয়।"

হরিয়ানা, পাঞ্জাব, রাজস্থান, এমনকী উত্তরপ্রদেশ থেকেও শ'য়ে শ'য়ে গবাদিপশু এনে রাতের অন্ধকারে সীমা পার করে বাংলাদেশে পাঠানো হয়। বি এস এফ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত বছর গবাদি পশু পাচার করতে গিয়ে ৮৫ জন নিহত হন বি এস এফের গুলিতে, ২০০৮-এ গুলিবিদ্ধ পাচারকারীর সংখ্যা ছিল ১১০। এবছরের মার্চে বি এস এফের ডি জি রামন শ্রীবাস্তবের সঙ্গে বাংলাদেশ রাইফেলসের মেজর জেনারেল মহম্মদ মইনুল ইসলামের দীর্ঘ পাঁচদিন বিভিন্ন বিষয় আলোচনা হয়। তার মধ্যে এই 'গবাদি পশু-পাচার'-এর বিষয়টি ছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ। দু'পক্ষই গবাদি পশু-পাচার রোধ করতে ঐক্যমত্য হন বলে সংবাদ-সূত্রের খবর। কিন্তু তারপর মাস চারেক কেটে গেলেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি বলে দেখা যাচ্ছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত 'ঠুঁটো জগন্নাথ' সেজে না থেকে গবাদি পশু রপ্তানির ব্যাপারে আইন-প্রণয়ন করা। যাতে ধরা পড়া পাচারকারী অন্তত আইনের ফাঁক গলে পালাতে না পারেন। তবে তাঁরা এও বলছেন, আইন থাকলেই হবে না সেটা কার্যকর করাও খুব জরুরী।

# ডায়মণ্ডহারবারে মৌলবাদী সন্ত্রাস

*(১ পাতার পর)*

অনেকগুলি গ্রাম থেকে মেলাতে লোকেরা এসে থাকে। মুসলিমরাও অংশগ্রহণ করে থাকে— উদ্দেশ্য যাই থাক না কেন। আনন্দের বাতাবরণ হঠাৎ বদলে যায় ছোট্ট একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে। কয়েকজন মুসলিম ছেলে ঘুরে ঘুরে মেলায় আগত হিন্দু মেয়েদের উত্যক্ত করতে থাকে। সর্বশেষে গাছের চারা চুরিকে কেন্দ্র করে ঘটনা অন্যদিকে গড়াতে শুরু করে। এই ছেলেরা সব স্থানীয় ফকিরপাড়া এলাকায় বাস করে। মেলা কমিটি বাধ্য হয়ে তাদের ধরে ফেলে ও কেউ কেউ শারীরিক ভাবে চড় থাপ্পড় মারে। কিছুক্ষণের মধ্যে মুসলিমরাও কিছু করার চেষ্টা করে যদিও অপরাধ প্রমাণ হওয়ায় তখনকার মতো নিরস্ত হয়। পরের দিন সকাল সাতটা-সাড়ে সাতটা নাগাদ ফকিরপাড়ার মসজিদ ভাঙা হয়েছে বলে সর্বত্র প্রচার হতে থাকে যা সর্বৈব মিথ্যা।

মুসলিম যুবকদের ৬০-৭০ জনের দল সশস্ত্র অবস্থায় পাশের হিন্দুগ্রাম হাতিপাড়ায় আক্রমণ করে। স্থানীয় পঞ্চ দেবতার মন্দির ভাঙচুর করে, বাড়ীর উপর আক্রমণ শুরু করে। হিন্দুরা অত সকালে কিছু বুঝে ওঠার আগে এই ঘটনা ঘটে। কিছুক্ষণের মধ্যে কয়েকশো মুসলিম ওখানে এসে হাজির হয়। পাশে বাগারিয়া গ্রামে আক্রমণ শুরু করে। ততক্ষণে দুষ্কৃতকারীদের সংখ্যা হাজার ছাড়িয়ে যায়। কাকদ্বীপ রোডের উপরে এসে কচুবেড়িয়া, শ্যামবসুর চক বাজারে হিন্দুদের দোকান ভাঙচুর, মন্দির নষ্ট করার কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলে। ওই একই সময়ে ওখান থেকে ১৫-২০ কিলোমিটার দূরেও বড় বাজার, গ্রাম ও মন্দিরের উপরে বিভিন্ন গুজব ছড়িয়ে মুসলিম দুষ্কৃতকারীদের দ্বারা আক্রমণ সংগঠিত হয়। হটুগঞ্জ বাজারের উপর হাজার সংখ্যায় মুসলিম দুষ্কৃতকারীরা পথ অবরোধ শুরু করে। বেছে বেছে হিন্দু মালিকের ও সরকারী বাসগুলিকে ভাঙচুর করতে থাকে।

৫০-৬০ টি বাসকে ভেঙে তছনছ করা হয়। কয়েকটি ট্রেকার, অটো পুড়িয়ে দেওয়া হয়। মগরাহাট, দেউলে স্টেশনে কয়েক ঘণ্টার জন্য ট্রেন অবরোধ করা হয়। পুলিশবাহিনী সেটাকে বাধা দেবার চেষ্টা করলে পুলিশের লাঠি কেড়ে পুলিশকে পেটানো শুরু হয়। পুলিশ শূন্যে গুলি চালাতে বাধ্য হয়। ইতিমধ্যে দুটি পুলিশগাড়ীতে আগুন লাগিয়ে দেয়। বেশ কয়েকজন পুলিশকর্মী আহত হয়ে হাসপাতালে এখনও ভর্তি আছেন। সাম্প্রতিক এইসব ঘটনাগুলির দিকে তাকালে এটা মনে হওয়া স্বাভাবিক—আজ শ্রীনগর বা কাশ্মীর উপত্যকায় জঙ্গিগোষ্ঠী যে পরিকল্পনা করে এগোচ্ছে এবং গুজব রটিয়ে নিত্য নতুন সন্ত্রাসের সৃষ্টি করছে, তার সঙ্গে হুবহু মিল রয়েছে। একই সাথে ফোন ব্যবহার বা পূর্ব পরিকল্পনা মতো বিস্তৃত এলাকায় আক্রমণ শানিয়ে হিন্দুদের সন্ত্রস্ত করা এটা কোনও হঠাৎ ঘটে যাওয়া ঘটনা নয়,—বরং এর পিছনে বড় হাত রয়েছে। হাজার হাজার হিন্দুকে ভয় দেখিয়ে, বাড়ীঘর ভেঙে, মন্দিরের বিগ্রহকে কলুষিত করে, হিন্দু মেয়েদের উপর নির্যাতন করে যে সন্ত্রাস তারা দেখালো তা সত্যিই ভাববার বিষয়।

এতকিছু ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর দোষীরা বহাল তবিয়তে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

গত ১৪ জুলাই সন্ধ্যার সময় দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলায় জেলাশাসক খলিল আহমেদ ও পুলিশ সুপার এস মীনা স্থানীয় লোকেদের নিয়ে নামকে ওয়াস্তে শান্তি মিটিং করেন। দোষীদের সম্পূর্ণ ছাড় দেওয়া হয়। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমেও 'গোষ্ঠী সংঘর্ষ' বলে যে রিপোর্টিং প্রকাশিত হয়েছে তাও বিভ্রান্তিকর।

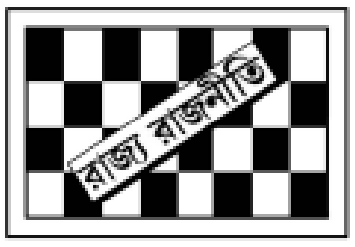


# আসন্ন পরিবর্তনের আভাসে গোষ্ঠীকোন্দল শুরু

**নিশাকর সোম**

এরাজ্যের প্রায় সকল দলেই কিছুটা বিশৃঙ্খলতা দেখা যাচ্ছে। এটা মূলত রাজনৈতিক। প্রথমেই দেখা যাক সিপিএমের মধ্যেকার বিশৃঙ্খল অবস্থা। রাজনৈতিক দিক থেকে দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বুঝে গেছেন যে নির্বাচনের মাধ্যমে কেন্দ্রে ক্ষমতা দখল বা রাষ্ট্রক্ষমতা দখল সম্ভব নয়। উপরন্তু এর ফলে পার্টির মধ্যে দুর্নীতি প্রবেশ করে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, গত শতাব্দীতে বৃটিশ কমিউনিস্ট নেতা গ্যালাকার সংসদীয় ব্যবস্থায় কমিউনিস্টদের অংশগ্রহণের বিরোধিতা করে বলেছিলেন, এর ফলে কমিউনিস্টরা দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়বেন। লেনিন এই কথার বিরোধিতা করে লিখলেন, "বামপন্থী কমিউনিজম শিশুসুলভ বিশৃঙ্খলা।" লেনিন আরও বলেন যে গ্যালাকার নির্বাচিত হয়ে প্রমাণ করুন যে কমিউনিস্টরা সংসদীয় ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করে দুর্নীতিগ্রস্ত হয় না। ইতিহাসের নির্মম পরিহাস— গ্যালাকারের আশঙ্কা এ দেশের কমিউনিস্টরা অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলে প্রমাণ করে দিলেন। এ যেন উপোসী ছারপোকার রক্ত পান। পয়সা খেতে খেতে শেষ পর্যন্ত সিকিউরিটি গার্ডদের সংগঠনেও হিস্যা খাওয়া। সিপিএম-এর একাধিক নেতা-কর্মীকে শ্যামল চক্রবর্তী কমিশন অপরাধী বলে চিহ্নিত করেছেন।

সম্প্রতি প্রমোদ দাশগুপ্ত'র শততম জন্মবার্ষিকীতে সিপিএম-এর সাধারণ সম্পাদক প্রকাশ কারাতের বক্তব্যের পটভূমি হলো— সিপিএম আর কোনও রাজ্যে পশ্চিমবঙ্গের মতো তিন দশক টিকে থেকে পার্টির ভাবমূর্তিকে কলঙ্কিত করতে পারবে না। কারাত পার্টির সপ্তম কংগ্রেস-এ গৃহীত কর্মসূচীর ১১২ ধারার কথা মনে করিয়ে দেন। এই ধরনের রাজ্য সরকারে অংশগ্রহণের সময় মনে রাখা দরকার যে একটি ক্রান্তিকালীন সরকার যার কাজ হবে জনগণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠন করে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জনগণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে শ্রমিক-কৃষকের স্বার্থরক্ষা করা। এই জন্যই সংগ্রাম করা।

হা-হতোস্মি, পশ্চিমবঙ্গের সিপিএম পরিচালিত সরকার যত বছর গেছে, শুধু সরকারে টিকে থাকার জন্য অনৈতিক পথ নিতে দ্বিধা করেনি। কারণ সরকারে টিকে থেকে লুটের রাজত্ব করাটাই লক্ষ্য। ফলে শ্রমিক-কৃষক, গরীব-মেহনতি মানুষের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে দেশী-বিদেশী পুঁজিপতিদের পূজায় মত্ত থেকেছে। তাইতো সিঙ্গুর নন্দীগ্রাম ঘটানো হলো।

এই দৃষ্টিভঙ্গির দরুণ কমিউনিস্ট পার্টিকে কামিয়ে নেওয়ার পার্টি বলে সাধারণ মানুষ অভিহিত করেন। এর থেকে লজ্জার কথা আর কি হতে পারে? সম্প্রতি কাগজে একটা ঘটনা প্রকাশিত হয়েছে। তা' হলো এক লোকাল কমিটির সম্পাদক একাধিক বাড়ি-গাড়ি করে পার্টি থেকে সম্প্রতি বহিষ্কৃত হয়েছেন। আলিপুর ট্রেজারি কেলেঙ্কারী, সল্টলেক মাটি ভরাট কেলেঙ্কারী, এসবের রিপোর্ট প্রকাশ্যে আসেনি। এসব জ্যোতি বসুর আমলে। আর এখনতো পার্টিতে মনসবদার, জমিদার, প্রমোটারদের প্রাধান্য।

আজ সিপিএম-এর রাজ্য-নেতৃত্বের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস নষ্ট হয়ে গেছে। সিপিএম মন্ত্রীরা একে অপরের দুর্নীতি প্রকাশ করে দিচ্ছেন। কারণ তিনি নিজে দুর্নীতিগ্রস্ত নন এটা দেখতে চান।

বর্তমানে রাজ্যের মন্ত্রীগণ স্থবিরত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন। মহাকরণের আমলারা মন্ত্রীদের

> "আজ সিপিএম-এর রাজ্য-নেতৃত্বের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস নষ্ট হয়ে গেছে। সিপিএম মন্ত্রীরা একে অপরের দুর্নীতি প্রকাশ করে দিচ্ছেন। কারণ তিনি নিজে দুর্নীতিগ্রস্ত নন এটা দেখতে চান।"

কথায় মূল্য দেন না। আমলাদের একাংশ নিয়মিতভাবে বিরোধী নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছেন। পুলিশের একাংশও বিরোধীদের দিকে চলে গেছে। সিপিএম-এর কথায় তাঁরা আর চলতে চাইছেন না। আমলাদের দেওয়া হতাহতের সংখ্যা বিধানসভায় পেশ করার পর আমলারা মুখ্যমন্ত্রীকে বলেছেন যে "রাজনৈতিক হত্যার সংজ্ঞা বলে দিন।" বিধানসভাতেই প্রবীণ সিপিএম বিধায়ক রবীন মণ্ডল পুলিশ-প্রশাসনের সমালোচনা করেছেন। মন্ত্রিসভার মধ্যে ডঃ অসীম দাশগুপ্ত ও সূর্য মিশ্রকে বেশি দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এদিকে বাইপাসের জমি নিয়ে রেজ্জাক মোল্লা এবং অশোক ভট্টাচার্য —এই দুই মন্ত্রীর মধ্যে দ্বন্দ্ব চলছে। একে অপরকে দুর্নীতিগ্রস্ত বলে ইঙ্গিত করছেন।

সিপিএম-এর রাজ্য-সম্পাদকমণ্ডলীতে মদন ঘোষ, দীপক সরকার, সূর্য মিশ্র, রবীন দেব এক হয়েছেন। দীপক সরকার-কে হুগলী জেলা পার্টি দেখার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। দীপক সরকার স্থায়ীভাবে কলকাতায় চলে এসেছেন মাওবাদী আক্রমণের ভয়ে। রাজ্য সিপিএম-এর নেতৃত্বের ছন্নছাড়া অবস্থা। এই নেতৃত্ব বিধানসভা নির্বাচনে নেতৃত্ব দিতে ব্যর্থ হবেই। সিপিএম-এর আর উঠে দাঁড়ানোর মনোবল ফিরে পাওয়া অসম্ভব। প্রকাশ কারাতও চান রাজ্য-নেতৃত্ব তথা মন্ত্রিত্ব ডুবে যাক, প্রমাণ হোক তাঁদের অন্যায়।

এবার দেখা যাক প্রদেশ কংগ্রেস-এর অবস্থান কেমন! কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতৃত্ব তৃণমূল তথা মমতা-কে ধরে রাখার জন্য সবরকম কনসেশন দিতে প্রস্তুত আছে। কারণ সোনিয়া গান্ধী দেখছেন যে সিপিএম-সিপিআই কংগ্রেস বিরোধিতায় দৃঢ়। বিজেপি ধীরে ধীরে এগোচ্ছে। ২০১৪-কে সামনে রেখে কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতৃত্ব যে কোনও রকমের সুবিধাবাদী অবস্থান নেবেন। তাইতো সোনিয়া গান্ধীকে মানস ভুঁইয়া 'মা' বলে সম্বোধন করার পর সোনিয়া বলেছেন যে "নেতাদের খুশি করার চেষ্টা না করে রাজ্যে কাজ করে দেখান। সিপিএম-এর বিরুদ্ধে তোলপাড় করে তুলুন। এদিকে খেজুরিতে রাহুল গান্ধীর ক্যাডার ঊষা নাইডুকে তৃণমূলীরা মারধোর করে সভা করতে দেয়নি। মন্ত্রী তথা তৃণমূল নেতা শিশির অধিকারী বলেছেন, "মেদিনীপুরে সভা করতে গেলে আমাদের অনুমতি নিতে হবে।" বস্তুত এ রাজ্যে কংগ্রেসকে তৃণমূলের অধীনেই থাকতে হবে। কারণ বিধানসভায় জিতে মন্ত্রিসভায় মমতার দাক্ষিণ্যে মন্ত্রী হবার সুযোগ নিতে হবে মানসবাবুকে। এ রাজ্যে কংগ্রেস-এর আরও ভাঙন হবে। এর মধ্যে থেকে একটা অংশ তৃণমূলে যাবেন। আর একটা আগামী বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে এক নতুন গোষ্ঠীতে পরিণত হয়ে নিজস্ব কায়দায় চলবে। ভবিষ্যতে এসব দেখা যাবে এটাই জনৈক প্রদেশ কংগ্রেস নেতার বিশ্লেষণ।

তৃণমূলের মধ্যেও ক্ষমতার লড়াই শুরু হয়েছে। সাংসদ ডাঃ সুচারু হালদারকে এক সভায় শুভেন্দু অধিকারীর সামনে জুতো ছুঁড়ে মারা হয়েছে। ব্যারাকপুরে জনৈক তৃণমূল নেতা রেলে চাকরি দেবার নাম করে লক্ষ লক্ষ টাকা চাকরী-প্রার্থীদের কাছ থেকে নিয়েছিল। তাঁকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। মমতা নির্দেশ দিয়েছেন— নেতারা স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করুন। নতুন লোক মঞ্চে আসুক। মমতা কি অন্য কাউকে নেতা হবার সুযোগ দেবেন? রাজনীতি থেকে বসে যাওয়া পঙ্কজ ব্যানার্জি কি বলেন?

# দ্রুততম স্যাটেলাইট

**নিজস্ব প্রতিনিধি।।** প্রচারমাধ্যমের দৌলতে এই খবরটা এতদিনে অনেকেরই জানা হয়ে গিয়েছে যে গত দু'বছরের প্রচেষ্টায় ব্যাঙ্গালোর শহর থেকে মাত্র ২০ কিলোমিটার দূরে ইয়ালাহানকা বলে একটি জায়গায় নিট্টে মীনাক্ষী ইনস্টিটিউট অব্ টেকনোলজিতে (এন এম আই টি) ভারতের ক্ষুদ্রতম স্যাটেলাইটটি তৈরি হয়েছে। জনমানসে একটা সংশয় তৈরি হচ্ছিলই যে এত ছোট স্যাটেলাইটটি আদৌ কার্যকরী হবে তো? একে স্যাটেলাইট না বলে এন এম আই টি-র ছাত্র-ছাত্রীরা এটাকে 'পিকো স্যাটেলাইট' বলে অভিহিত করছিলেন। শুনলে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয় যে এই 'পিকো স্যাটেলাইট'টির ওজন ১ কেজিরও বেশ কম। এর নাম রাখা হয়েছিল স্টাডস্যাট। সম্প্রতি অন্য চারটে স্যাটেলাইটের সঙ্গে পি এস এল ভি, সি-১৫ পর্যদের তত্ত্বাবধানে শ্রী হরিকোটায় সফলভাবে স্যাটেলাইটির অবতরণ ঘটে। নিরসন হয় সমস্ত সন্দেহের। একটি দৈনিক সংবাদপত্রের বিস্ময়—'হোয়াই ইন্ডিয়া'স স্মলেস্ট স্যাটেলাইট ইজ সাচ আ বিগ ডিল!'

*প্রকল্প কো-অর্ডিনেটর এম রাজেশের সঙ্গে এন এম আই টি-র ছাত্রছাত্রীরা।*

তবে এই স্যাটেলাইট তৈরির কৃতিত্ব শুধুমাত্র এন এম আই টি-র একার নয়। এন এম আই টি ছাড়াও কর্ণাটকের আরও তিনটি কারিগরী বিদ্যা-প্রতিষ্ঠান যেমন রামাইয়া ইনস্টিটিউট অব্ টেকনোলজি, আর ভি কলেজ অব্ ইঞ্জিনিয়ারিং, এম এন এস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি, ব্যাঙ্গালোর-এর ছাত্র-ছাত্রীদের যেমন অবদান রয়েছে এর পেছনে তেমনি অন্ধ্রপ্রদেশেরও তিনটি কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের অবদান রয়েছে 'স্টাডস্যাট' তৈরির পেছনে। সব মিলিয়ে ওই সাতটি প্রতিষ্ঠানের মোট চল্লিশ জন ছাত্র-ছাত্রীর অবদান রয়েছে এতে। যদিও এন এম আই টি-র ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যাই তাদের মধ্যে বেশি। ছাত্র-ছাত্রীদের এই অসামান্য উদ্যোগে পূর্ণ সহযোগিতা করেছে ভারতের স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশন (ইসরো)।

ইসরোর স্মল স্যাটেলাইট প্রজেক্টের প্রজেক্ট ডিরেক্টর ডি ভি এ রাঘবমূর্তি এ প্রসঙ্গে জানিয়েছেন— 'বছর দেড়েক আগে একটি মউ (মেমোরেন্ডাম অব আন্ডারস্ট্যান্ডিং) চুক্তি সাক্ষরিত হয়েছিল। সেই সময়েই ছাত্র-ছাত্রীরা একটি প্রাথমিক নকশা তৈরি করে নিয়ে এসেছিল। একথা অনস্বীকার্য যে এরপর চুক্তি মেনে ইসরো সহযোগিতা করলেও ছাত্র-ছাত্রীদের 'ক্যাপাবিলিটি' ছিল বলেই স্টাডস্যাট পাঠানোর সিগন্যাল পাওয়া গিয়েছে। ১২ জুলাই ১১টা বেজে ৭ মিনিটে যখন প্রথম আলোক-সংকেত পাঠানো হয়েছিল স্যাটেলাইটটি থেকে তখনই ছাত্র-ছাত্রীরা বুঝে যান যে তাদের স্বপ্ন স্বার্থক হতে চলেছে। কোনও গবেষক নয়, কোনও বিজ্ঞানী নয়, কোনও মহাকাশবিদ নয়, স্রেফ প্রযুক্তি ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারা তৈরি দেশের ক্ষুদ্রতম স্যাটেলাইট 'স্টাডস্যাট' তখন পাড়ি দিচ্ছে 'অন্যরকম' আবাহনে।

# মন্ত্রী হিমন্ত টাডা'র আসামী কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতির দাবি

**সংবাদদাতা ॥** টাডা মামলার আসামী হয়েও বহাল তবিয়তে পরপর দুবার অসম বিধানসভার সদস্য হয়ে মন্ত্রীত্ব করেছেন বর্তমান স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা। তিনি এখন দোর্দণ্ডপ্রতাপমন্ত্রী। তাঁর একটি নিজস্ব ২৪ ঘণ্টার বৈদ্যুতিন নিউজ চ্যানেলও রয়েছে বলে খবর। মামলাটা হয়েছিল—১৯৯১ সালে TADA Case No-77/91, তবে কোনও নথিপত্র পাওয়া যাচ্ছিল না। ক'মাস আগে এই নিয়ে বিধানসভায় বিরোধী দল, অগপ নেতাদের সঙ্গে বিস্তর কথা কাটাকাটি হয়েছিল। জেনেবুঝে খোঁচাটা দিয়েছিলেন একদা সহকর্মী থাকা প্রফুল্ল মহন্ত। তখন হিমন্ত অনেক অকথা-কুকথা শুনিয়েছিলেন। বিধানসভা অধ্যক্ষের হস্তক্ষেপে ব্যাপারটা তখনকার মতো ধামাচাপা পড়ে যায়।

এখন আবার কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতির নেতা অখিল গগৈ সেই হিমন্তের টাডা মামলার হারানো ফাইল উদ্ধার করে সংবাদ মাধ্যমের সামনে প্রকাশ করে দিয়েছেন। ফলে মাটির তলা থেকে কালকেউটে বের হয়ে পড়েছে। বিশ্বস্ত সূত্রে প্রাপ্ত সংবাদে জানা গেছে, একটি জনস্বার্থ মামলা গত ২০০৪ সালে (PIL No.16/2004) দায়ের করা হয়েছিল। তখনকার গুয়াহাটি শহরের পুলিশ প্রধান হীরেন্দ্র চন্দ্র নাথ আদালতকে জানিয়েছিলেন, প্রধান বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের (সি জে এম) নির্দেশ অনুসারে (৮ জানুয়ারি, ১৯৯৯ জারি) চাঁদমারি থানায় (কেস নং-৭৭/৯১) আবার নতুন করে মিসিং কেস পুনর্গঠন করা হচ্ছে। নতুন করে তদন্ত হলেও প্রমাণের অভাবে কেসটি দুর্বল হয়ে পড়েছিল বলে অখিল গগৈ জানিয়েছেন। মূল নথিপত্র খুঁজে পাওয়াতে এখন অবস্থাটা পুরোপুরি বদলে গেছে। অখিলবাবু বলেছেন, দোষীদের শাস্তির জন্য তাঁরা সুপ্রীম কোর্ট, রাজ্যপাল, প্রধানমন্ত্রী, ইউ পি এ-র চেয়ারপার্সন (সোনিয়া গান্ধী) এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে যাবেন।

আরও জ্ঞাতব্য, ডি এস পি অর্পণ কুমার দাস ডি আই জি অসীম কুমার রায়কে ফাইলটি দিয়েছিলেন। পরে শ্রীরায় আর তা ফেরৎ দেননি বারবার অনুরোধ সত্ত্বেও। তদন্তকারী অফিসাররা ফাইলে যেসব সাক্ষীর জবানবন্দী ছিল তা আদালতে দেখাতে পারেননি। রাজ্যের জনগণকে জানানো হয়েছিল— 'ফাইল মিসিং'।

*হিমন্ত বিশ্বশর্মা*

*অখিল গগৈ*

এবার দেখা যাক, কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতির নেতা অখিল গগৈ তার হাতে কি কি ডকুমেন্ট আছে বলে দাবী করছেন—

১। চাঁদমারী থানার কেস ডায়েরি (কেস নং-৭৭/১৯৯১)।

২। পানবাজার থানার কেস ডায়েরি (কেস নং-১৫/১৯৯১)।

● মানবেন্দ্র শর্মা হত্যাকাণ্ড বিষয়ক যাবতীয় নথিপত্র।

● আগের সব কেসের সীজার লিস্ট।

● 'হিমন্ত বিশ্বশর্মা'র কেসে সাক্ষীদের জবানবন্দী বা বয়ান।

● হিমন্ত বিশ্বশর্মাকে পুলিশী জিজ্ঞাসাবাদের বিবরণ।

● হিমন্ত বিশ্বশর্মার হাতের খেলার নমুনা।

● উলফা (ULFA)-র নাম করে টাকা তোলার রসিদ।

গু উলফার লেটারহেডে লেখা চিঠিপত্র।

গু বিভিন্ন পুলিশ অফিসারের ঘটনাস্থল পরিদর্শনের বিবরণ।

এছাড়া হিমন্তবাবুর স্বীকারোক্তির কিছু অংশও মিডিয়াকে দেখিয়েছেন অখিল গগৈ। শ্রীগগৈ গত ১০ জুলাই সাংবাদিক বৈঠকে দাবী করেন যে, হিমন্তবাবু অন্ততঃপক্ষে তিনজন অসমীয়া অফিসারকে (উচ্চপদস্থ আমলা) রীতিমতো ধমক দিয়েছেন। প্রশ্ন তুলেছেন, একজন মন্ত্রী শপথগ্রহণ করে কিভাবে একাজ করতে পারেন? এটা সংবিধান লঙ্ঘনের মতো গুরুতর অপরাধ। যে তিনজন বি ডি ও-র জন্য মন্ত্রী আই এ এস অফিসারদের হুমকি দিয়েছেন তারা (বি ডি ও-রা) সবাই দুর্নীতিগ্রস্ত। জরুরী অবস্থায় ইন্দিরা জমানার মতো হিমন্ত একনায়কতান্ত্রিক আচরণ করেছেন বলে গগৈ-এর অভিযোগ।

এদিকে একই দিনে অন্য এক সাংবাদিক সম্মেলনে অখিল গগৈ-এর পিছনে হেডিওয়েট রাজনীতিবিদ্‌রা রয়েছে বলে হিমন্তবাবু মন্তব্য করেছেন। তিনি আরও বলেছেন, একবছর আগে কেস ডায়েরীগুলো দেওয়ার পরিবর্তে পরোক্ষভাবে তাঁর কাছে কুড়ি লক্ষ টাকা চাওয়া হয়েছিল। তিনি ওই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন, কেননা ততদিনে আদালত তাঁকে অব্যাহতি দিয়ে দিয়েছে। তাঁর কাছে অখিলের তথাকথিত ডকুমেন্ট 'বাতিল কাগজ' বই অন্য কিছু নয়।

এখন মামলা চালু হলেই বোঝা যাবে সাচ্চা-ঝুটা কি বা কে।

# মাও নিশানায় সেনা ব্যারাক

সংবাদদাতা ॥ দেশে মাওবাদী দমনে সেনা অভিযান হোক বা না হোক, সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে পাল্টা আঘাত হানার জন্য মাওবাদীরা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জঙ্গিদের সাহায্যে বড় ধরনের প্রস্তুতি নিয়েছে। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা এজেন্সিগুলি সম্প্রতি সরকারকে এই মর্মে রিপোর্ট দিয়ে সতর্ক করেছে।

গোয়েন্দা রিপোর্টে বলা হয়েছে, এই আঘাত হানার জন্য মাওবাদীরা আধুনিক ক্ষমতাসম্পন্ন রকেট লঞ্চার সহ নানা ধরনের অস্ত্র ও গোলা-বারুদও জোগাড় করেছে। সেনাবাহিনীর যে কোনও 'স্ট্রাইকিং ইউনিট'-এ বিস্ফোরণ ঘটিয়ে মূলত একটা হইচই পাকানোর উদ্দেশ্যেই তারা এই রসদ সংগ্রহ করেছে। রসদ সংগ্রহের ব্যাপারে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের একটি জঙ্গি সংগঠন তাদের সাহায্য করছে বলেও গোয়েন্দা রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। গোয়েন্দাদের তরফে এই রিপোর্ট পেয়ে স্বাভাবিকভাবেই নড়েচড়ে বসেছে কেন্দ্র ও রাজ্য প্রশাসন। মাওবাদীদের বিরুদ্ধে সরাসরি সেনা অভিযান চালানো নিয়ে দিল্লির তরফে এখনও কোনও স্থির সিদ্ধান্ত না নিতে পারার পেছনে অন্যান্য কারণের সঙ্গে এই রিপোর্ট একটি বিবেচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

জানা গিয়েছে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার নিরাপত্তা বিষয়ক কমিটির বৈঠকেও মাওবাদীদের এই সম্ভাব্য পাল্টা আঘাত হানার ফলে সেনাবাহিনীর মনোবলে চিড় ধরার কথা উঠে আসে। তার আগে অবশ্য সামরিক বিভাগের তিন প্রধানও কেন্দ্রীয় সরকারকে এ বিষয়ে তাদের অভিমত জানিয়ে দেন। গোয়েন্দা রিপোর্টে বলা হয়েছে, এখনও সিদ্ধান্ত না নিতে পারলেও কেন্দ্র যে কোনও সময়ে তাদের বিরুদ্ধে সেনা অভিযান চালাতে পারে বলে মনে করছে মাওবাদীদের শীর্ষ নেতৃত্ব। সেই কারণে তাদের সংগঠনের মিলিটারি শাখাকে পুরোদস্তুর প্রস্তুত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

প্রধানত অসম, মণিপুর, ছত্তিশগড়, ঝাড়খণ্ড ও ওড়িশার জঙ্গলে জোর কদমে মিলিটারি শাখার ক্যাডারদের ট্রেনিং দেওয়ার কাজ চলছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ওই দুই রাজ্য সহ তাদের প্রভাব থাকা সব রাজ্য মিলিয়ে প্রায় হাজার পাঁচেক মিলিটারি ক্যাডারকে তৈরি রাখার প্ল্যান করেছে মাওবাদীরা। রি-ট্রেনিং চলছে পশ্চিমবঙ্গের জঙ্গলমহলের বেশ কিছু জায়গায়। এই মিলিটারি ক্যাডারদের প্রত্যেকের কাছেই একাধিক আগ্নেয়াস্ত্র ও ল্যান্ড মাইন ও পর্যাপ্ত গুলি দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। শুধু তাই নয়, বছর তিনেক আগে অসমের দুর্ধর্ষ জঙ্গি সংগঠন আলফা এবং মণিপুরের জঙ্গি সংগঠন মণিপুর পিপলস লিবারেশন আর্মি (এমপিএলএ)-র সাথে মাওবাদীরা চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল। আলফার সঙ্গে মাওবাদীদের নীতিগত দূরত্ব বাড়লেও এম পি এল এ-র সঙ্গে চুক্তির ভিত্তিতে বেশ কয়েকটি রকেট লঞ্চার মাওবাদীদের সরবরাহ করেছে। এর সাহায্যে কোনও সেনা ছাউনিতে আঘাত হানার পরিকল্পনাও করা হয়েছে। সেনা অভিযান শুরু হলে মাওবাদীরা যে কোনও সেনা ছাউনিতে আক্রমণ করতে পারে বলে ঠিক করেছে। প্রসঙ্গত এমপিএলএ পশ্চিমবঙ্গের মাওবাদীদের বেশ কিছুদিন যাবৎ আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলা-বারুদ সরবরাহ করে আসছে।

# সংস্কৃত শিক্ষার পরিকাঠামো জানাতে নির্দেশ দিল হাইকোর্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাজ্যের সংখ্যালঘু শ্রেণী, মাদ্রাসা, উর্দু, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, মুসলমান মহিলাদের ক্ষমতায়ণ, ছাত্রবৃত্তি, সুদ ব্যতিরেকে সংখ্যালঘু ছাত্র-ছাত্রীদের বার্ষিক আড়াই লক্ষ টাকা পর্যন্ত

*প্রধান বিচারপতি জে এন প্যাটেল*

ঋণ, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্তদের কোনও জামিনদার ছাড়াই ২৫,০০০ টাকা পর্যন্ত ঋণ, নতুন মাদ্রাসা তৈরি, মাদ্রাসা সংস্কারে ব্যাপক আর্থিক সাহায্য, মুসলমান ছাত্র-ছাত্রীদের উন্নত স্তরের কোচিং প্রদানকারী মুসলিম ধার্মিক সংস্থা ''আল আমীন মিশন'' (অমুসলিমদের কোচিং দেওয়ার কোনও খবর নেই)-কে ঢালাও অর্থ সাহায্য দিচ্ছে।

অপর পক্ষে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার টোল এবং অন্যান্য সংস্থাকে কানাকড়িও ঠেকাচ্ছে না। এক হিসেবে রাজ্যে বর্তমানে ১৪৪টি টোল পরিকাঠামোহীন, অব্যবস্থিত, অস্বীকৃত (সরকারি মঞ্জুরী বিহীন) এবং আর্থিক অনটনে জর্জরিত। সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করার অবকাশই নেই রাজ্য সরকারের। সংস্কৃত কেবল হিন্দুরাই শেখে বা হিন্দুদের জন্যই—এমন কোনও কথা নয়। দু'বছর আগে কেরলের এক সাধারণ মুসলিম ছাত্রীর স্নাতকোত্তর স্তরে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হওয়ার খবর প্রায় সব সংবাদপত্রে বেরিয়েছিল। অথচ পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর শিক্ষাক্ষেত্রে সংস্কৃত ভাষাকে আবশ্যিক তৃতীয় ভাষার পরিবর্তে ঐচ্ছিক করে স্কুল স্তর থেকে একরকম উৎখাত করা হয়েছে। ফলে চরমতম অবহেলার শিকার 'সংস্কৃত'।

কলকাতা হাইকোর্টের সম্মাননীয় প্রধান বিচারপতি জে এন প্যাটেল এবং মাননীয় বিচারপতি ভাস্কর ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চ গত ২ জুলাই কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার পরিকাঠামো বর্তমানে কি অবস্থায় রয়েছে তা হলফনামা দিয়ে জানাতে বলেছেন। জনৈক রবি শর্মার দায়ের করা এক জনস্বার্থ সম্পর্কিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতেই উপরোক্ত ডিভিশন বেঞ্চ তা জানতে নির্দেশ দেন। আবেদনকারীর পক্ষে বলা হয়েছে—ভারতীয় সমাজের মূল ভিত্তি সংস্কৃত ভাষা। তা সত্ত্বেও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার উপযুক্ত কোনও পরিকাঠামোই এ রাজ্যে নেই। যদিও সকল ভারতীয় ভাষার উদ্ভব সংস্কৃত থেকেই। সুপ্রীম কোর্ট ২০০৬ সালেই রাজ্য সরকারকে জানিয়েছিল, সংস্কৃত শিক্ষাব্যবস্থা যথোপযুক্তভাবে গড়ে তোলার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে। কিন্তু তার পরেও নিজভূমে চরমতম অবহেলার স্বীকার সংস্কৃত ভাষা।

# হিন্দু গ্রামগুলিতে মুসলিমদের পুনর্বাসন দেওয়া হচ্ছে

তরুণকুমার পণ্ডিত ঃ মালদা ॥ প্রতি বছর বর্ষাকালে নদী ভাঙন এক ভয়াবহ সমস্যা হিসাবে মালদা জেলার মানচিত্রে স্থান দখল করে নিয়েছে। কখনও গঙ্গা কখনও ফুলহার নদীর ভাঙনে গ্রামের পর গ্রাম নদী গর্ভে তলিয়ে যাচ্ছে। এই বছর মালদার মানিকচকের কাছে ফুলহার নদীতে ব্যাপক ভাঙনে এখন পর্যন্ত ৫০টি বাড়ি তলিয়ে গেছে। মালদার রতুয়ার দুটি গ্রাম— দেবীপুর ও কমলপুরে ৩৫টি বসতভিটা ফুলহার নদীর গর্ভে চলে গেছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, সেচ দপ্তরের গাফিলতিতে নদী এখানকার জমি ও বাড়ি গ্রাস করছে। সেচ দপ্তরের মহানন্দা ডিভিশনের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার নির্মল কুমার বর্মন বলেন, মানিকচকের কাছে ফুলহার নদী গঙ্গায় মিশেছে। গ্রাম দুটি পাশাপাশি অবস্থিত। জলস্তর বেশী থাকায় ফুলহার থেকে প্রবল বেগে জল ঢুকছে গঙ্গায়।' তার জেরে চলছে এই ভাঙন। দুটি নদীর জলস্তর সমান না হওয়া পর্যন্ত ভাঙন রোধ করা সম্ভব নয়। গত মাসে ফুলহার নদী ভাঙন রোধের কাজ পরিদর্শনে এসে বিক্ষোভের মুখে পড়েন মামা-ভাগ্নি তথা দক্ষিণ মালদার সাংসদ আবু হাসেন খান চৌধুরী ও উত্তর মালদার সাংসদ মৌসম নূর। এলাকার ভাঙন-দুর্গত মানুষরা তাদের ঘিরে ধরে জরুরী ভিত্তিতে কাজ শেষ করার দাবী জানায়। এদিকে নদীর ওপারে বিলাইমারী অঞ্চলের ভাঙন দুর্গতদের এপারের হিন্দু অধ্যুষিত এলাকাতে বসানোর প্রতিবাদে এস ডি ও এবং বি ডি ও-র কাছে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে দেবীপুরের বাসিন্দারা। যেহেতু ওপারের বিলাইমারী অঞ্চলের লোকেরা পুলিশের খাতায় দুষ্কৃতী হিসাবে চিহ্নিত, তাই দেবীপুরের বাসিন্দাদের আশঙ্কা এপারে ওদের বসালে হিন্দুদের মন্দিরসহ মেয়েদের মান-সম্মান নষ্ট হবে। বাসিন্দাদের বক্তব্য, ভাঙন দুর্গতদের বাঁধের ওপরে বসানোর ব্যবস্থা করুক প্রশাসন। উল্লেখ্য ১৯৮৬ সালে হিন্দুদের এইসব জায়গাগুলি সেচ দপ্তর অধিগ্রহণ করলেও বাসিন্দারা তাদের জমির প্রাপ্য টাকা এখনও পর্যন্ত পায়নি।

# নকশাল দমনে কেন্দ্রের ভূমিকায় অসন্তুষ্ট মুখ্যমন্ত্রীরা

**নিজস্ব প্রতিনিধি ॥** মাওবাদী দমন নিয়ে কেন্দ্রের ভূমিকায় আদৌ সন্তুষ্ট হতে পারছেন না ভারতের নকশাল-অধ্যুষিত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা। ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী রমন সিং সরাসরি কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন— "শুধু ডায়লগ দিয়ে কোনও সমস্যার সমাধান হতে পারে না। নকশালবাদ ও সন্ত্রাসবাদ একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। চূড়ান্ত যুদ্ধের সময় এসে গেছে। সশস্ত্র লড়াই করা ছাড়া নকশালবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আর বিকল্প কোনও পথ নেই।" 'ভোটের তাগিদে'ই সম্ভবত একটু অন্যভাবে সমস্যাটার ব্যাখ্যা করছেন নীতিশ কুমার। তাঁর বক্তব্য— "নকশাল সমস্যার সমাধানের জন্য সমাজের সর্বস্তরের উন্নতিও বাঞ্ছনীয়। তাঁদেরকে বিশেষ কোনও স্বার্থ ভুল পথে চালিত করলেও তারা এখনও আমাদের সমাজেরই অংশ। কেন্দ্রীয় সরকারের 'এনফোর্সমেন্ট অ্যাকশন' মানুষের মনে বিচ্ছিন্নতাবোধ জাগিয়ে তুলতে একাই একশ'। তার ওপরে কেন্দ্র সরকার এনিয়ে রাজ্য সরকারকে যা সাহায্য করছে তা প্রয়োজনের তুলনায় একেবারেই অপ্রতুল।" সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে নকশাল দমনের ব্যাপারে গত ১৪ জুলাই যে বৈঠক করেছিলেন তাতে মুখ্যমন্ত্রীরা সরাসরি সমালোচনা করেছেন মাওবাদী দমন নিয়ে কেন্দ্রীয় নীতির।

ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়কের বক্তব্য— "চলতি আর্থিক বছরে মাওবাদী দমনের জন্য কেন্দ্রের উচিৎ রাজ্যগুলির জন্য বরাদ্দ বৃদ্ধি করা। কেন্দ্রের উচিত নিরাপত্তা সম্পর্কিত ব্যয় (সিকিউরিটি রিলেটেড এক্সপেন্ডেচার) বাড়িয়ে অন্তত ৬১.৫০ কোটি টাকা করা।" শ্রী পট্টনায়ক আরও দাবী করেন যে, আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা সম্পর্কিত যে ব্যয়টা রাজ্য-সরকার করবে, কেন্দ্রের উচিৎ তার অর্ধেক টাকা আগে-ভাগেই রাজ্যকে দিয়ে দেওয়া। পট্টনায়ক জানান, নকশাল অধ্যুষিত রাজ্যগুলোতে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের দিকে কেন্দ্রীয় সরকারের যে নজর দেওয়ার কথা তা তারা দিচ্ছে না। প্রসঙ্গত, ১৩তম অর্থ-কমিশনের কাছে এবছর ওড়িশা ৭০ কোটি টাকা দাবী করেছে। এছাড়াও বিশেষ পরিকাঠামো প্রকল্প (স্পেশাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার স্কিম)-এর আওতায় সবমিলিয়ে দেশের যে ৩৪টি বাছাই করা জেলাকে নিয়ে এসেছে কেন্দ্রীয় যোজনা কমিশন তার মধ্যে ওড়িশার কোরাপুট, সুন্দরগড়, ময়ূরভঞ্জ, কেওনঝাড় এবং কন্ধমাল জেলাকে অন্তর্ভুক্ত করার দাবী জানিয়েছেন নবীন।

অন্যদিকে অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী কে রোসাইয়া সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে নজরদারি বাড়ানোর জন্য কেন্দ্রকে পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি একইসঙ্গে কেন্দ্রীয়

*নবীন পট্টনায়েক*

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের উন্নয়ন কর্মসূচীর অন্তর্গত নকশাল অধ্যুষিত জেলার সংজ্ঞাকে অন্যভাবে নিরূপণ করার দাবী জানান। তথ্যাভিজ্ঞ মহলের ধারণা, নকশাল অধ্যুষিত জেলাগুলিকে বেছে নিয়ে তার সামগ্রিক উন্নয়নের যে কর্মসূচী কেন্দ্রীয় বাজেটে ঘোষিত হয়েছে তাতে বিস্তর গলদ রয়েছে। কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী কে রোসাইয়ার বক্তব্যে এই অভিযোগেরই প্রতিফলন ঘটেছে বলে তথ্যাভিজ্ঞ মহলের অনুমান। রমন সিং এনিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে দায়ী করার পাশাপাশি রাজ্যগুলোও এ বিষয়ে সচেতন নয় বলে উল্লেখ করেছেন। তবে তিনি এও বলেন— "বর্তমানে দেশজুড়ে যেভাবে নকশাল সমস্যা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে তাতে কোনও একটি রাজ্যের বা বিভিন্ন রাজ্যের আলাদা আলাদা ভাবে সচেতন হলেই চলবে না। এই সমস্যার বিরুদ্ধে যুঝতে জাতীয় কৌশল (ন্যাশানাল স্ট্রাটেজী) থাকা জরুরী। তিনি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পি. চিদাম্বরমকে উদ্দেশ্য করে সরাসরি বলেন— "নকশালদের সঙ্গে হাজার কথা বলেও কোনও সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। কারণ

*রমণ সিং*

তারা এখনও পর্যন্ত অস্ত্র ত্যাগ করেনি।"

তবে মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠকে কেন্দ্রীয় সরকার তীব্র সমালোচনার মুখোমুখি হয়েছিল বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমারের। সরকারের 'এনফোর্সমেন্ট অ্যাকশন' নিয়ে

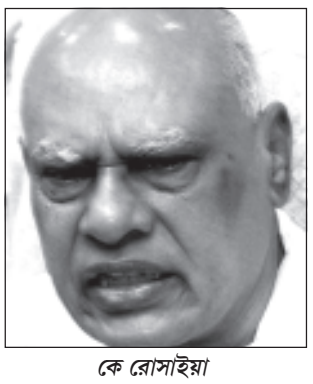

*কে রোসাইয়া*

কঠোর সমালোচনা করার পাশাপাশি মাওবাদী অধ্যুষিত এলাকায় যোজনা কমিশনের উন্নয়ন কর্মসূচী (ইনটিগ্রেটেড অ্যাকশন প্ল্যান ফর ডেভেলপমেন্ট) নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন। নীতিশের প্রশ্ন— 'দেশের ঘোষিত ৮৩টি নকশাল অধ্যুষিত জেলার মধ্যে যোজনা কমিশন মাত্র ৩৫টি জেলাকে তাদের উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতাভুক্ত করেছে। অর্থাৎ বাকিগুলো অনুন্নতই থাকবে! তাতে কি নকশাল সমস্যার সমাধান আদৌ সম্ভব?' এই সমস্যা দূর করার জন্য নীতিশের দাওয়াই— চাই সর্বাঙ্গীণ প্রয়াস (ইন্টিগ্রেটেড অ্যাপ্রোচ)। নীতিশের মূল কথা— 'এনফোর্সমেন্ট অ্যাকশন' আসলে নকশাল-সংগঠনের বিভিন্ন নেতাকেই জনপ্রিয় করে তুলছে।

সম্প্রতি সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন থেকে জানা যাচ্ছে প্রতি বছর সন্ত্রাসবাদী হানায় যত মানুষের মৃত্যু হয়, নকশাল-আক্রমণে মৃতের সংখ্যা তার থেকে বেশি। এরকম একটা খতিয়ান হলো যে ২০০৪ থেকে ২০০৮—এই ৫ বছরে গড়ে

*নীতিশ কুমার*

অন্তত ৫০০ জন করে নিরীহ মানুষকে মেরেছে মাওবাদীরা। ২০০৯-এ এই সংখ্যাটাই পৌঁছে যায় ৬০০-র কাছাকাছি। সব মিলিয়ে সারা দেশের ১৩৩টি জেলায় নকশালদের উপস্থিতি ধরা পড়ে, তার মধ্যে ৬৭টি জেলায় তাদের নাশকতা চালানোর খবর মেলে।

২০১০-এ ১৫৮টি জেলায় নকশালদের উপস্থিতির প্রমাণ পাওয়া যায়, ৮৫টি জেলায় ৩২৫ জন নিরীহ লোক ও ২০৯ জন নিরাপত্তারক্ষীর মৃত্যু হয়েছে নকশাল হামলায়। বাস্তবে দেখা গেছে এমন চারটি জেলায় মাওবাদীরা তাদের হত্যালীলা সংগঠিত করতে পেরেছে যেখানে ২০১০-এর আগে পর্যন্ত তাদের টুঁ-শব্দটিও পাওয়া যায়নি। এই পরিসংখ্যান থেকে একটা জিনিসই প্রমাণ হয় যে, মাওবাদী সমস্যা দিনে দিনে কিভাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। পর্যবেক্ষকদের আশঙ্কা, কেন্দ্র এখনই সতর্ক না হলে আগামীদিনে এই সমস্যা আরও ভয়ানক আকার ধারণ করবে।

মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে শূন্যপদে পুলিশ নিয়োগের পরামর্শ দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রীদের (যার মধ্যে কে. রোসাইয়ার মতো সরকারের সমালোচক কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রীরাও ছিলেন) সম্মিলিত সমালোচনার মুখে একগুচ্ছ প্রকল্পে হাত দিতে বাধ্য হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার।

এর মধ্যে পূর্ব-সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রয়েছে ছত্তিশগড়, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড এবং পশ্চিমবঙ্গে 'ইউনিফায়েড কম্যান্ড' চালু করবার ঘোষণা। এই রাজ্যগুলিতে আই জি পর্যায়ের আধিকারিকের নেতৃত্বে মাওবাদী দমনের জন্য কেন্দ্রীয় বাহিনী পাঠানো ও এই রাজ্যগুলির সম্মিলিত বোর্ডে একজন অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল থাকার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। চিঠিপত্র আদান-প্রদানের জন্য, বাহিনীর কোথাও যাওয়ার জন্য, খাদ্য সরবরাহ ও মানুষ-জনকে সরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য অতিরিক্ত হেলিকপ্টারের কথাও ঘোষণা করা হয়েছে। নকশাল অধ্যুষিত জেলাগুলিতে আগামী দু'বছরের জন্য প্রতিটি পুলিশ স্টেশনের জন্য দু'কোটি টাকা করে মোট চারশোটি পুলিশ থানা হয় স্থাপন, নয়তো শক্তিশালী করা হবে। ৩৪টি নতুন বাহিনীর গড়ে তোলার কথাও জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

বাহিনীগুলিতে অতিরিক্ত সেনা-আধিকারিক নিয়োগ করা হবে। ৩৪টি একেবারেই নকশাল অধ্যুষিত অনুন্নত জেলায় রাস্তা, সেতু ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য ৯৫০ কোটি টাকা খরচ করা হবে। এবং পি ই এস এ আইন সুদৃঢ় করে গ্রামসভার মাধ্যমে ছোট ছোট বনাঞ্চল রক্ষা করতে হবে।

# বিজেপিকে চটিয়ে বিপাকে নীতিশ

**নিজস্ব প্রতিনিধি ॥** ভোটের মুখে বিজেপি-কে চটিয়ে বেশ খানিকটা বিপাকেই পড়েছেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমার। সেই কারণে বিজেপি-র সাহায্যে বিহারে বিগত ৫ বছরে 'ভাল প্রশাসন' (গুড গভর্নেন্স) উপহার দেবার পরেও তাঁকে ঝুঁকতে হচ্ছে সমাজবিরোধীদের দিকে। মহম্মদ তসলিমুদ্দিন, আনন্দমোহন সিং-এর মতো দাগী আসামীদের নীতিশের সমর্থন করার কথা পাটনা-র রাজনৈতিক মহলে শোনা যাচ্ছিল বেশ কিছুদিন ধরেই। বিজেপি-র পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই এহেন নিন্দনীয় প্রচেষ্টার তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে। রাজনৈতিক মহল এ বিষয়ে কিছুটা অবাক কারণ বিগত ৫ বছরে বিহারের উন্নয়নের ব্যাপারে জে ডি ইউ-বিজেপি জোটের সাফল্য এতটাই উল্লেখযোগ্য যে কেন্দ্রীয় যোজনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান মন্টেক সিং আলুওয়ালিয়ার প্রশংসাও পেয়েছে তারা। 'অ্যান্টি ইনকাম্বেন্সি ফ্যাক্টর' (শাসকদলের বিরুদ্ধে ভোট দেবার প্রবণতা) -ও সেখানে যে একেবারেই কাজ করছে না গত লোকসভা নির্বাচনেই তার প্রমাণ মিলেছে। সুতরাং সমাজবিরোধীদের সাহায্য নেওয়াটা নীতিশের দরকার পড়ল কিসে? পর্যবেক্ষক মহল মনে করছে, বিহারে জাতীয় কর্মসমিতির বৈঠকের সময় বিজ্ঞাপনে নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে তার ছবি ব্যবহার করা নিয়ে নীতিশের একপ্রস্থ নাটক এবং পরবর্তীকালে ভারত-বনধের সময় নরেন্দ্র মোদীর ছবি হাতে বিজেপি কর্মীদের ওপর নীতিশের জনতা দল (সংযুক্ত)-এর কর্মীদের হামলা বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা আদৌ ভালভাবে নেননি। বিশেষ করে বিহারের আপামর হিন্দুরা এইসব ঘটনায় নীতিশের ওপর বেজায় চটে

*আনন্দমোহন*

গেছেন। তাদের মধ্যে একধরনের আতঙ্ক কাজ করছে যে, বর্তমানে সারা দেশেই সংঘটিত মুসলিম তোষণের রেশও পাটনায় না এসে পড়ে। হিন্দুদের এই আতঙ্কই নীতিশের কাছে 'ফিয়ার সাইকোসিস'-এর পর্যায়ে চলে গিয়েছে। হিন্দু ভোট এককাট্টা হলে এবং তা বিজেপি-র ভোট বাক্সে প্রতিফলিত হলে তখন মুখ্যমন্ত্রী থাকলেও জোট সরকারে তার গুরুত্ব যে একেবারেই তলানিতে এসে ঠেকবে, সেটা বিলক্ষণ বোঝেন নীতিশ। আর তা বুঝেই তিনি বিজেপি-র প্রতি যে অসৌজন্যমূলক ব্যবহার করেছিলেন (বিজেপি-র জাতীয় কর্মসমিতির বৈঠক চলাকালীন ডিনার-পার্টি বাতিল করে দিয়ে) যাতে করে মনে হয়েছিল তিনি হয়তো জোট করতে চাইছেন না, এখন আর সেই নিয়ে একেবারেই উচ্চবাচ্য করছেন না নীতিশ।

এমনিতে বিজেপি যদিও জোট করেই বিহারে পুনরায় ক্ষমতায় ফিরতে আগ্রহী, কিন্তু নানা কারণে নীতিশের ওপর তারা বিরক্ত। এর মধ্যে সর্বাগ্রে রয়েছে, মাওবাদী দমন নিয়ে বিহারের মুখ্যমন্ত্রীর ইচ্ছাকৃত টালবাহানা। 'ভোটের টানে' নীতিশ বেশ নরম মাওবাদীদের প্রতি, তার ওপরে মাওবাদী বিরোধী পুলিশী প্রশিক্ষণের জন্য বুদ্ধগয়ায় একটা ছোট মাঠ, যার ফায়ারিং রেঞ্জ ক্ষুদ্রস্য ক্ষুদ্র, বেছেছেন তিনি।

আজ যে তসলিমুদ্দিনকে বিহার বিধানসভায় নিজের দলের হয়ে টিকিট দিতে চলেছেন, একদা আশির দশকে বিহার বিধানসভা কমিটির কাছে এই

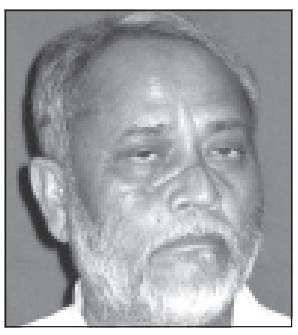

*তসলিমুদ্দিন*

বিরুদ্ধে বহু অপরাধমূলক কাজকর্মে জড়িয়ে থাকার অভিযোগ থাকলেও এদের নেবার পেছনে নীতিশের অন্য অঙ্ক কাজ করছে। কুর্মী, কুশাবাহা এই দুই জাতির লোকেরা রীতিমতো দুর্দশাগ্রস্ত। তারওপর কেন্দ্রীয় বদান্যতায় এদের মাওবাদী বদনাম রয়েছে। সেই দিক দিয়ে 'মাওবাদী' নিয়ে নরম নীতি গ্রহণ করে এবং ওইসব এলাকার মাফিয়াদের নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য আনন্দ মোহনের সঙ্গে গাঁটছড়া বাধতে চাইছে নীতিশ। অন্যদিকে কিষাণগঞ্জ, পূর্ণিয়া, আরারিয়া, প্রভৃতি অনুপ্রবেশ কবলিত জেলায় মুসলিম ভোট-ব্যাঙ্ককে নিজের ভোটবাক্সে বন্দী করার তাগিদে তসলিমুদ্দিনের হাত ধরেছেন নীতিশ। তার ওপরে গোটা বিহার জুড়ে ১৬ শতাংশ মুসলিম ভোটের তাগিদ তো রয়েইছে। কিন্তু নীতিশের চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে বাকি হিন্দু ভোট, সেই সাথে জনজাতি ভোটও।

জনজাতি এলাকায় আনন্দমোহনের গায়ের জোর এবার কতটা খাটবে তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে রাজ্যের তথ্যাভিজ্ঞ মহলের। কিন্তু জয় নিয়ে নিশ্চিত রাজ্যের বিজেপি শিবির। কারণ তাদের বক্তব্য, ভোটের মুখে নীতিশ যতই অপরাধীদের প্রশ্রয় দিক না কেন, বিগত ৫ বছরে ভাল কাজের একটা সুফল পাবেই। সব অন্যায়ের প্রতিবাদে অংশীদারী হলেও জোটধর্ম মেনেই জোটে রয়েছে বিজেপি। এক বিজেপি নেতার রসিকতা— "মুসলিম ভোটব্যাঙ্কের ক্ষেত্রে নীতিশের মূল প্রতিপক্ষ লালুর আর জে ডি। কিন্তু আর জে ডি প্রথম ল্যাপে এগিয়ে আছে বুঝে নীতিশের মাথা খারাপ হয়ে গেছে। নইলে তসলিমুদ্দিনের সাথে কেউ হাত মেলায়!"

## চেনা মোহনবাগান, অচেনা মোহনবাগান

# ভেসে যায় আদরের নৌকো

**অর্ণব নাগ**

মোহনবাগান অ্যাথলেটিক ক্লাব কোনও ক্লাবের নাম নয়, একটি প্রতিষ্ঠানের নাম। এমন একটা প্রতিষ্ঠান যা বিশ শতকের গোড়ায় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিল, স্বাধীনতার জ্বলন্ত অঙ্গারে আপনাকে দগ্ধ করেছিল, বাংলার নবজাগরণকে পূর্ণতা দিয়েছিল, আপামর বঙ্গবাসীর হাসি-কান্নার, সুখ-দুঃখের প্রতীক হিসেবে প্রতিভাত হয়েছিল। সব কথাই 'দ্বন্দ্বদ্ধ দ্বন্দ্ব-দ্বন্দ্ব'-এ বলতে হচ্ছে মানে মোহনবাগান অতীত তা নয়, আজও মোহনবাগানের জেতা-হারা বহু

*সুধীর চ্যাটার্জীর মজা করে বলা কথাই শেষপর্যন্ত সত্যি হলো— স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে মোহনবাগানের প্রথম শিল্ড জয় (১৯৪৭)। ১৯১১-র শিল্ড জয়ের তুলনায় যা কোনও অংশে কম গৌরবজনক নয়।*

*ভূপেন বসু*

পরিবারকে হাসায়-কাঁদায়, বহু পরিবারে মোহনবাগানের জয় ভুরিভোজের কিংবা হার অরন্ধনের বার্তা বয়ে আনে। ১২১ বছরের জীবনে বাঙালির সঙ্গে আজ এতটাই একাত্ম হয়ে যেতে পেরেছে মোহনবাগান। বড় ম্যাচ জিতলে বাইপাসের ধারে চলে মোহন-সমর্থকদের উদ্দাম-নৃত্য, গলদা-চিংড়ির প্রতিচ্ছবি নিয়ে লাফালাফি, সবুজ-মেরুন আবির খেলা, কাগজে তৈরি পালতোলা নৌকো নিয়ে নাচানাচি। বড় ম্যাচ, মানে ইষ্টবেঙ্গলের সঙ্গে খেলা থাকলে এবং তাতে জয় পেলে সেখানে লাল-হলুদকে হারানোর আনন্দ যত না কাজ করে তার থেকে বোধহয় বেশি কাজ করে সবুজ-মেরুনের জয়ের আনন্দ। এক মোহনবাগান সমর্থক আমায় বলেছিলেন— 'মোহনবাগানের প্রতিদ্বন্দ্বী পাল্টে ছে বারে বারে কিন্তু মোহনবাগান পাল্টায়নি।' খুব খাঁটি কথা। প্রথম দিকে পুরনো কলকাতার কতগুলি ক্লাব যেমন কুমোরটুলী, ভবানীপুর এরা ছিল মোহনবাগানের প্রতিদ্বন্দ্বী। এরপর ১৯১১-এ আই এফ এ শিল্ড জয়ের পর থেকে ইষ্ট- ইয়র্কশায়ার ও অন্যান্য বৃটিশ দলগুলোই হয়ে উঠল মোহনবাগানের মুখ্য প্রতিপক্ষ। তারপর এল মহামেডান। তারও পরে ইষ্টবেঙ্গল। একথা বলাই বাহুল্য, মোহনবাগানের সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী প্রতিপক্ষের নাম ইষ্টবেঙ্গল। একদিন কে জানে হয়তো এটাও পাল্টে যাবে। কারণ ঘটি-বাঙালের দৃষ্টিকোণ থেকে মোহনবাগান-কে বিচার করলে চলবে না। যাঁরা জীবনে শত প্রলোভন সত্ত্বেও স্রেফ ভালবাসার টানে মোহনবাগান ছাড়া অন্য কোনও ক্লাবে ফুটবল খেলেননি, ময়দানী পরিভাষায় যাদের 'ঘরের ছেলে' আখ্যা দেওয়া হয়েছে, এরকম পাঁচ মোহনবাগানীর মধ্যে শৈলেন মান্না আর সত্যজিত চ্যাটার্জী বাদে বাকি তিনজন অর্থাৎ গোষ্ঠ পাল, চুনী গোস্বামী এবং সুব্রত ভট্টাচার্য তিনজনেই বাঙাল। মোহনবাগান তাই আপামর বাঙালীর প্রতিষ্ঠান, ভারতবর্ষের জাতীয় ক্লাব, দেশের গর্ব। শত বাধা হাজার ঝড়-ঝাপ্টা সত্ত্বেও মোহনবাগানের পালতোলা নৌকো আজও অপ্রতিহত। একথা অনস্বীকার্য যে বাংলা তথা বাঙালীর নবজাগরণ এবং বিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে একটি অপরিহার্য মৌলিক উপাদান হলো মোহনবাগান প্রতিষ্ঠানটি স্বয়ং। সুবিশাল সেই ইতিহাসটা স্বল্প ব্যবধানে লিপিবদ্ধ করণ অসম্ভব। তাই এই নিবন্ধে মোহনবাগান কিভাবে একটি প্রতিষ্ঠানরূপে পরিগণিত হচ্ছে; সেই সংক্রান্ত কিছু চেনা, স্বল্প চেনা অথবা একেবারেই অচেনা তথ্য ঘাঁটার চেষ্টা করা হলো।

প্রসঙ্গত লিখলাম বটে, মোহনবাগানের পালতোলা নৌকো আজও অপ্রতিহত। কিন্তু ক্লাবের শুরুর সময় তার 'সিম্বল' মোটেই পালতোলা নৌকো ছিল না, ছিল সুন্দরবনে বিশ্রামরত রয়েল বেঙ্গল টাইগারের ছবি। সম্ভবত, ১৯১১-এর আই এফ এ শিল্ড জয়ের সময়েও মোহনবাগানের প্রতীক ছিল 'রয়েল বেঙ্গল টাইগার'। যে কারণে বৃটিশদের পক্ষাবলম্বী তৎকালীন 'দ্য স্টেটসম্যান' পত্রিকা শিল্ড জয়ের পর কটাক্ষ করেছিল 'বন্যেরা বনেই সুন্দর' বলে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রায় অন্তিম পর্যায়। দু'জনের দাপটে বঙ্গদেশের রাজনীতি রীতিমতো উত্তাল। একজন তরুণ— নাম সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভবিষ্যতের রাষ্ট্রনেতা। অন্যজন সবে অ্যার্টনশিপ পাশ করা যুবক, নাম ভূপেন্দ্রনাথ বসু, ভবিষ্যতের জননেতা এবং মোহনবাগান ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা। ১৮৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস। দলটির প্রতিষ্ঠাতা এক ইংরেজ ভদ্রলোক, অ্যালেন অক্টেভিয়ান হিউম, হলেও তাতে দেশের পরাধীনতার শৃঙ্খল-মোচনের জন্য অনেক লোক যোগ দিয়েছিলেন। তাদেরই একজন ছিলেন জননেতা ভূপেন্দ্রনাথ বোস। ১৮৮৬ সালে দাদাভাই নৌরোজির সভাপতিত্বে কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে তিনি ছিলেন একজন স্বেচ্ছাসেবক। পরবর্তীকালে ১৯১৪ সালে তিনি মাদ্রাজ কংগ্রেসে সভাপতিও নির্বাচিত হয়েছিলেন। জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার ঠিক চার বছর পরেই জন্ম হয় মোহনবাগান ক্লাবের। তার জন্মলগ্নে কলকাতার তিনটি বনেদী পরিবারের অবদান ভোলার নয়। ১৪নং বলরাম ঘোষ স্ট্রীটের বসু-বাটী, ৪৪নং রামকান্ত বসু স্ট্রীটের সেন-বাড়ি এবং ১০৩ নং কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটের (অধুনা বিধান সরণী) মিত্র-বাটীর আঁতুড়ঘরেই জন্ম নিয়েছিল মোহনবাগান। জন্মলগ্নেই সভাপতির গুরুদায়িত্ব পালন করতে হয়েছিল জননেতা ভূপেন্দ্রনাথ বসুকে। ১৯০৫ সালে শুরু হলো বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন। তাতে জড়িয়ে পড়লেন ভূপেন্দ্রনাথ। তাঁর সুযোগ্য ভ্রাতুষ্পুত্র যতীন্দ্রনাথ বসু সেই সময় মোহনবাগানকে যোগ্য নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। ১৯১১ সালটা এক্ষেত্রে খুব ইম্পর্ট্যান্ট। ওই বছরেরই ২৯ জুলাই ইষ্ট-ইয়র্কশায়ারকে হারিয়ে ঐতিহাসিক আই এফ এ শিল্ড জিতেছিল মোহনবাগান। যার শতবর্ষ আজ সমাগত। জয়ের দিন একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছিল। জয়ী দলের সদস্য রেভারেন্ড সুধীর চ্যাটার্জী বিজয়োল্লাসে মত্ত। তাই প্রথমে খেয়াল করেননি। যখন খেয়াল করলেন দেখলেন ধুতি চাদর পরিহিত সৌম্যমূর্তি দীর্ঘশ্মশ্রু অশীতিপর এক বৃদ্ধ ভিড় ঠেলে অতিকষ্টে তাঁর দিকে এগিয়ে আসছেন। বৃটিশদের জাতীয় পতাকা ইউনিয়ন-জ্যাকের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে সুধীরকে সেই বৃদ্ধ টি জিজ্ঞাসা করলেন—শিল্ড তো জিতলে কিন্তু ওটা নামবে কবে? মজা করেই সুধীর উত্তর দিয়েছিলেন, 'আমরা আবার যবে জিতব, তবে'। সেদিন ভাগ্যদেবতা বোধহয় মুচকি হেসেছিলেন। নইলে ১৯১১-র পর ১৯৪৭-এই বা কেন মোহনবাগান দ্বিতীয়বার আই এফ এ শিল্ড জিতবে, আর ওই বছরই বা কেন ইউনিয়ান জ্যাক অবনমিত হবে, আকাশে উড়বে ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা। আসলে মোহনবাগান আর দেশের স্বাধীনতা বোধহয় ভাগ্যদেবীর ইচ্ছেতেই পরস্পর অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে গিয়েছিল। তার আরও একটা প্রমাণ হলো মোহনবাগানের প্রতিষ্ঠার দিনও যে ১৫ আগস্ট! খন্ডিত হলেও সেই দিনেই তার আটান্ন বছর পর ভারতবর্ষের কপালে জুটেছিল স্বাধীনতা। যদিও মোহনবাগানের জন্মদিনটি নিয়ে একটু 'কনফিউশন' রয়েছে। কিন্তু একথা ঐতিহাসিকভাবে সত্য ১৮৮৯-এর ১৫ আগস্টেই ভূপেন বসুর বাড়িতে একটি সভা হয় এবং তাতেই চূড়ান্ত হয়ে যায় মোহনবাগান ক্লাবের নকশা। মোহনবাগান নামটা কেন হলো সেই নিয়েও রয়েছে কিছুটা ধন্দ। অতুলকৃষ্ণ রায় তাঁর 'শর্ট হিস্ট্রি অব্ ক্যালকাটা' বইতে লিখেছেন রাজা নবকৃষ্ণদেবের দত্তক পুত্র এবং 'শব্দ কল্পদ্রুম' প্রণেতা স্যার রাজা রাধাকান্তদেবের বাবা

*যতীন বসু*

গোপীমোহন দেবের নাম অনুসারেই মোহনবাগান নামকরণ হয়েছে। কলকাতা গবেষক রাধারমণ মিত্রের মতে মোহনবাগানের প্রথম খেলার মাঠ ছিল যেখানে, সেই কীর্তি মিত্রের 'মোহনবাগান ভিলা' থেকে এহেন নামকরণটি হয়েছে। আবার সাংবাদিক প্রদীপ রক্ষিত ১৮৮৭ সালে প্রকাশিত কলকাতা কর্পোরেশনের মানচিত্র উদ্ধার করে দেখিয়েছেন তখনও মোহনবাগান রো এবং মোহনবাগান লেন নামে দুটি রাস্তা ছিল, যে রাস্তা দুটি বর্তমান কলকাতাতেও বর্তমান। মোহনবাগানের প্রতিষ্ঠা ওই চত্বরেই বলে সেই রাস্তা দু'টির নাম থেকেও 'মোহনবাগান' নামকরণ বিচিত্র কিছু নয়। এনিয়ে আরও অনেক মত রয়েছে কিন্তু ঐতিহাসিকভাবে কীর্তি মিত্রের 'মোহনবাগান ভিলা' থেকেই 'মোহনবাগান' নামকরণ হয়েছে, এটাই এখনও পর্যন্ত সর্বাপেক্ষা স্বীকৃত মতবাদ।

যাই হোক না কেন, প্রতিষ্ঠালগ্নে এর নাম ছিল মোহনবাগান স্পোর্টিং ক্লাব। পরের বছর ক্লাবের বর্ষপূর্তি' অনুষ্ঠানে সভাপতি হয়ে আসেন প্রখ্যাত ব্যাকরণবিদ এবং প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক এফ জে রো। তাঁরই পরামর্শে স্পোর্টিং-এর জায়গায় অ্যাথলেটিক শব্দটি বসানোয় নতুন নামকরণ হয় 'মোহনবাগান অ্যাথলেটিক ক্লাব'। 'স্পোর্টিং' শব্দটিতে রো সাহেবের আপত্তির কারণ ছিল যেহেতু ক্লাবে রাইফেল ছোঁড়া, মাছ ধরা ইত্যাদি 'স্পোর্টিং'-এর কোনও বন্দোবস্ত ছিল না। সেকালের সদস্যদের সম্পর্কে মোহনবাগান ক্লাব-কর্তৃপক্ষের বিধিনিষেধ নিয়ে অতুল মুখার্জীর মনোমুগ্ধকর বিবরণ— "প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের বাদ দিলে নতুন সদস্য গ্রহণ করার ব্যাপারে ক্লাবের কর্তৃপক্ষরা শুধুমাত্র ছাত্র-সদস্য নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। সেখানেও অভিভাবকদের লিখিত অনুমতির

*(এরপর ৯ পাতায়)*

# দেশের অলিম্পিক অভিযানে মোহনবাগানীদের অবদান

**জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়**

মোহনবাগান ক্লাব, নামটি শুনলেই হৃদয়ের গ্রন্থিগুলি টানটান হয়ে ওঠে অবিমিশ্র এক আবেগে। বাঙালির যে কটি গর্বের অভিজ্ঞান এখনও মাথা উঁচু করে বেঁচে আছে তার অন্যতম মোহনবাগান ক্লাব। শতবর্ষ অতিক্রম করেও মোহনবাগান বাঙালির ক্রীড়াসংস্কৃতির প্রতীকী ব্যঞ্জনা হয়ে জীবনকে আনন্দ দিয়ে চলেছে। ১৮৮৯ সালে কলকাতার তিন ঐতিহ্যশালী পরিবার মিলে যে ক্লাবটির জন্ম দিয়েছিলেন উত্তর কলকাতার এক গলিতে তা আজ জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃত ও সর্বজনপ্রিয়। দেশের সীমানা ছাড়িয়ে বিদেশেও তার সম্মান ও শ্রদ্ধার আসন বিছিয়ে রেখেছে।

ভারতীয় ফুটবলে মোহনবাগানের অবদান বলে শেষ করা যাবে না। প্রথম ভারতীয় ক্লাব হিসেবে ঐতিহাসিক আই এফ এ শিল্ড জয় দিয়ে মোহনবাগানের গৌরবময়গাথা মণ্ডিত পথ পরিক্রমার সূচনা। তারই স্মরণে আজ দিকে দিকে পালিত হচ্ছে শতবার্ষিকী উৎসব। তেমনই স্মরণীয় ঘটনা ১৯৬৪-তে ক্লাবের প্ল্যাটিনাম জুবিলি উৎসব। তৎকালীন বিশ্ব ফুটবলে 'সুপার পাওয়ার' হাঙ্গেরীর জগৎবিখ্যাত তাতাবানিয়া ক্লাব ও কমনওয়েলথ ক্রিকেট টিমের আর ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে হকি ম্যাচ আয়োজন— এরকম নানা উপাচারে ৭৫ বছরপূর্তি উৎসবটি সব অর্থেই বর্ণময় ও মাত্রাবহ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ওইসব ঘটনার সাক্ষী ক্লাবের প্রবীণ সদস্যরা এখনও তার স্মৃতিচারণে মশগুল থাকেন ক্লাবের প্রশস্ত চত্বরে বসে।

আলোচ্য নিবন্ধে অবশ্য অলিম্পিকে মোহনবাগান ক্লাবের তরফে যারা ভারতের

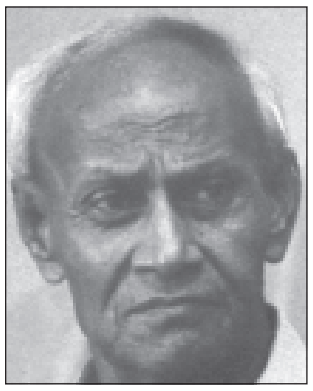

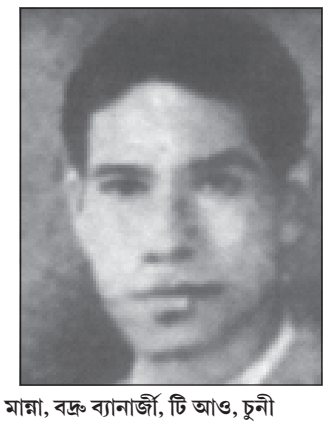

(ঘড়ির কাঁটার দিক অনুযায়ী) শৈলেন মান্না, বদ্রু ব্যানার্জী, টি আও, চুনী

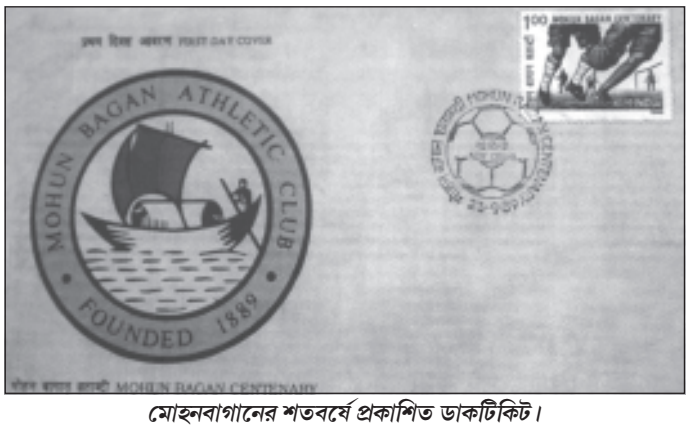


*মোহনবাগানের শতবর্ষে প্রকাশিত ডাকটিকিট।*

অধিনায়কত্ব করেছেন তাদের সম্বন্ধেই মুখ্যত আলোচনা করা হয়েছে। ভারত প্রথম অলিম্পিক ফুটবলে অংশ নেয় ১৯৪৮ সালে লন্ডন অলিম্পিকে। স্বাধীনতার পর প্রথম অলিম্পিক। তাই স্বভাবতই একদা শাসক ইংরেজদের দেশের রাজধানীতে চলা অলিম্পিকে ভারতীয়রা কেমন ফল করে তা নিয়ে প্রবল উৎসাহ উদ্দীপনা ছিল জনমানসে। সেবার ভারতীয় ফুটবল দলের অধিনায়ক হয়েছিলেন নাগাল্যাণ্ড থেকে মোহনবাগানে খেলতে আসা ডাঃ টি আও। সদ্য আর জি কর মেডিকেল কলেজ থেকে পাশ করা ডাক্তার টি আও ছিলেন কুশলী ডিফেন্ডার। 'গ্রেট' শৈলেন মান্নার পাশে দাঁড়িয়ে মোহনবাগান রক্ষণকে নির্ভরতা দিয়েছেন। বলাইদাস চ্যাটার্জিকে সেই অলিম্পিকে জাতীয় দলের ম্যানেজার করে পাঠানো হয়। তিনিও ছিলেন আদ্যন্ত মোহনবাগানী। দীর্ঘদিন এই ক্লাবে খেলেছেন, পরে সফল প্রশাসক হিসেবে কাজ করেছেন।

বলাইদাস চ্যাটার্জি অবশ্য শুধু ফুটবলেই নয় বক্সিংয়েও উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। একাধিক বিদেশ সফরে বক্সিং দলের কর্মকর্তা হিসেবে গুরুদায়িত্ব সামলেছেন। লন্ডন অলিম্পিকে ভারতীয় দলের ৭/৮ জন ফুটবলার ছিলেন মোহনবাগানের। অধিনায়ক আও ছাড়াও ছিলেন শৈলেন মান্না, মহাবীর প্রসাদ, মেওয়ালাল, ভরদ্বাজের মতো ভারতবিখ্যাত সব ফুটবলার। ওই অলিম্পিকে ভারত প্রথম খেলায় ফ্রান্সের কাছে ২-১ গোলে হারলেও যে খেলা মেলে ধরেছিলেন ভারতীয়রা তা দেখে মুগ্ধ হয়ে গেছিল গোটা স্টেডিয়াম। স্টেডিয়ামের রয়্যাল বক্সে আসীন স্বয়ং রাণী এলিজাবেথ পর্যন্ত ড্রেসিংরুমে বার্তা পাঠিয়ে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন মান্নাদের। অলিম্পিকের পর বাছাই বিশ্বএকাদশে স্থান পেয়েছিলেন লেফট আউট রমন। শৈলেন মান্না ছিলেন স্ট্যান্ডবাই খেলোয়াড়।

এরপর ১৯৫২-র হেলসিঙ্কি অলিম্পিক। এই অলিম্পিক অবশ্য ভারতের কাছে চিরকালীন দুঃস্বপ্নের। বৃষ্টির পর ভিজে মাঠে খালি পায়ে খেলতে নামা ভারতীয় দল

*(এরপর ১৪ পাতায়)*

# ভেসে যায় আদরের নৌকো

*(৮ পাতার পর)*

প্রয়োজন ছিল। ছাত্রদের ক্ষেত্রে আরও নিয়ম করা হয় যে ছ'মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পরই তাঁরা সদস্য হতে পারবেন। অর্থাৎ ছাত্রদের সদস্য হওয়ার আগে যোগ্যতা নির্ধারণ করা হোত তাদের আচার-ব্যবহারের ওপর। পড়াশুনো ঠিক মতো করছে কিনা সে সম্পর্কেও খোঁজ নেওয়া হোত। এ ব্যাপারে প্রথম সম্পাদক যতীন্দ্রমোহন বসু বিশেষভাবে নজর রাখতেন। ধূমপান করা নিয়ে কঠোর বিধিনিষেধ ছিল, ধূমপান করার অভিযোগ প্রমাণিত হলে সদস্য থেকে নাম কাটা যেত।"

তবে বিদেশীদের হারিয়ে মোহনবাগানের কাপ-জয়ের নিরীখে আই এফ এ শিল্ড-ই প্রথম টুর্নামেন্ট নয়। তার আগে ১৯০৫ সালে মোহনবাগান গ্ল্যাডস্টোন কাপের ফাইনালে বৃটিশদের ডালহৌসীকে ৬-১ গোলে হারিয়েছিল। খেলাটি হয়েছিল চুঁচুড়ায়। কাকতালীয়ভাবে ওই বছরই ডালহৌসী আরেক বৃটিশ-দল ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাবকে ৪-৩ গোলে ফাইনালে হারিয়ে আই এফ এ শিল্ড জয় করেছিল। ১৯১১-এ আই এফ এ শিল্ড ফাইনালে শক্তিশালী মিলিটারি দল ইষ্ট-ইয়র্ক রেজিমেন্টের বিরুদ্ধে জয়টা একদিনেই আসেনি বা 'ফ্লুকে' হয়নি। নগ্ন পায়ের এগারোটি বঙ্গসন্তান প্রথম রাউণ্ডে সেন্ট জেভিয়ার্সকে ৩ গোলে, দ্বিতীয় রাউন্ডে রেঞ্জার্সকেও ৩ গোলে, তৃতীয় রাউন্ডে রাইফেল ব্রিগেডকে ১ গোলে এবং সেমিফাইনালে মিডলসেক্স রেজিমেন্ট-কে ৩ গোলে হারিয়ে তবে ইষ্ট-ইয়র্কশায়ারের মুখোমুখি হয়েছিল মোহনবাগান। সবচেয়ে লক্ষণীয় বিষয়, এতগুলো শক্তিশালী বৃটিশ দলের বিরুদ্ধে অসম-লড়াই-এ ফাইনালের আগে পর্যন্ত একটা গোলও খায়নি মোহনবাগান। বোঝাই যাচ্ছে, এগারোটি নগ্নপদের 'ডিফেন্স' এগারোটি বুটের 'ফরওয়ার্ড' লাইনের বিরুদ্ধে কতটা শক্তিশালী ছিল তখন। তাই নতমস্তকে মোহনবাগানের শিল্ড জয়কে শ্রদ্ধা জানিয়েছিল বৃটেনের প্রথম শ্রেণীর সংবাদমাধ্যমগুলি, যেমন, 'দৈনিক ম্যাঞ্চে ষ্টার গার্ডিয়ান', 'ডেইলি মেল', লন্ডন, রয়টার নিউজ এজেন্সী প্রভৃতি। বাঙালি সংবাদপত্রগুলোতে তো ঘটা করে মোহনবাগানের শিল্ড জয়ের সংবাদ প্রকাশিত হয়েইছিল, এমনকী 'সিঙ্গাপুর টাইমস', 'এম্পায়ার' প্রভৃতি বাইরের দেশের খবরের কাগজেও এই জয়ের সংবাদ পরিবেশিত হয়েছিল।

লেখার একদম গোড়াতেই বলেছি মোহনবাগান অ্যাথলেটিক ক্লাব কোনও ক্লাবের নাম নয়, একটি প্রতিষ্ঠানের নাম। শুধু ফুটবলেই নয়, ক্রিকেট, হকি, অ্যাথলেটিক্স, টেনিস প্রতিটি খেলায় মোহনবাগান তার কৃতিত্বের সাক্ষর রেখেছে। বঙ্গভঙ্গের পটভূমিতে গোরাদের হারিয়ে মোহনবাগানের এগারোজন নগ্নপদের বঙ্গ সন্তানের আই এফ এ শিল্ড জয় যদি জাতীয়তাবাদের পরিচায়ক হয় তবে স্বীকার করতেই হবে মোহনবাগানের প্রাতিষ্ঠানিকতার সূচনা হয়েছিল সেই দিনই। উত্তর কলকাতার বসু-মিত্র-সেনদের প্রতিষ্ঠা করা পারিবারিক ক্লাব বাঙালীর স্বাধীনতাকামী জাতীয়তাবাদী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল সেই ২৯ জুলাইয়েই, ১৯১১ সালে। তারপর দীর্ঘ শতবর্ষের প্রচেষ্টায় সেই প্রাতিষ্ঠানিকতা আরও মজবুত হয়েছে, স্বীকৃতি পেয়েছে ভারতবর্ষের জাতীয় ক্লাবের। ক্রীড়াক্ষেত্রের সবকটি আঙ্গিকে মোহনবাগানের ১২১ বছরের সাফল্য লিপিবদ্ধ করতে গেলে তা মহাভারতকেও হার মানাবে। বরঞ্চ সামাজিকভাবে মোহনবাগানের অবদানের কিছু 'এভিডেন্স' একনজরে দেখা যাক। যে সামাজিক অঙ্গীকারই মোহনবাগানকে প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা এনে দিয়েছে।

১। মোহনবাগানই একমাত্র ক্লাব যার দুই সদস্য ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র ও বিচারপতি শ্যামল কুমার সেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল হয়েছিলেন।

২। মোহনবাগানের প্রথম সভাপতি ভূপেন্দ্রনাথ বসু ও প্রথম সম্পাদক যতীন্দ্রনাথ বসু সক্রিয়ভাবে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

৩। সর্বভারতীয় ফুটবল সংস্থার স্বীকৃতি হিসেবে মোহনবাগান 'জাতীয় ক্লাবে'র মর্যাদাপ্রাপ্ত।

৪। মোহনবাগানই একমাত্র ক্লাব যে ক্লাবের নামে এবং যে ক্লাবের বেশ কয়েকজন কর্মকর্তা ও খেলোয়াড়দের নামে কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় রাস্তা আছে। যথা— মোহনবাগান রো ও লেন, ভূপেন্দ্রনাথ বসু অ্যাভিনিউ, যতীন্দ্রনাথ বসু সরণী, গণেন্দ্র মিত্র লেন, শিবদাস ভাদুড়ী সরণী, গোষ্ঠপাল সরণী, উমাপতি কুমার সরণী, দীনবন্ধু সেন লেন।

৫। মোহনবাগানের প্রথম সভাপতি ভূপেন বসুর মর্মর মূর্তি শোভিত হচ্ছে শ্যামবাজারে।

৬। মোহনবাগানের 'ঘরের ছেলে' শৈলেন মান্নার নামে রয়েছে বাগুইআটিতে শৈলেন মান্না সরণী। জীবিত লোকের নামে রাস্তার নাম ভারতবর্ষের ইতিহাসে সম্ভবত এটাই প্রথমবার।

৭। ময়দানে রয়েছে মোহনবাগানের আরেক 'ঘরের ছেলে' চাইনীজ ওয়াল গোষ্ঠপালের স্ট্যাচু। ময়দানী ইতিহাসে এটাও প্রথমবার।

৮। মোহনবাগানের শতবর্ষ পূর্তিতে ভারত-সরকার স্মারক ডাক টিকিট প্রকাশ করেছিলেন।

৯। ফুটবল সম্রাট পেলে আর ফুটবল রাজপুত্র মারাদোনা দু'জনেরই বঙ্গদেশে পদার্পণ ঘটেছিল, মোহনবাগানের দৌলতে।

১০। মোহনবাগানের যে সমস্ত সদস্য কলকাতা পুরসভার মেয়র হয়েছেন তাঁরা হলেন স্যার হরিশঙ্কর পাল, আনন্দীলাল পোদ্দার, সুধীর রায়চৌধুরী, নরেশনাথ মুখার্জি, কেশবচন্দ্র বসু, রাজেন্দ্রনাথ মজুমদার, গোবিন্দ চন্দ্র দে, কমল কুমার বসু ও সুব্রত মুখার্জি।

পুনশ্চ, মোহনবাগানের ১৯১১-এর আই এফ এ শিল্ড জয় কিংবা ১৯০৫-এর গ্ল্যাডস্টোন কাপ জয়, দুটোই বৃটিশদের হারিয়ে। পরাধীন ভারতবর্ষে এহেন সাফল্য ব্যতীত সামাজিক দান আর কি-ই বা হতে পারত?

# মুসলমান বনাম মুসলমান

'ইসলাম' যে মানবতার শত্রু এবং বিশ্বশান্তির পথে অন্তরায় তা আবার প্রমাণিত হলো পাকিস্তানের একটি ঘটনায়। সম্প্রতি পাকিস্তানের দুটি আহমদিয়া মসজিদে মুসলিম সন্ত্রাসবাদীদের সশস্ত্র হামলা ও আত্মঘাতী বিস্ফোরণে ওই সম্প্রদায়ের মুসলিমরা তাঁদের সুরক্ষার ব্যাপারে সরকারের উদাসীনতার অভিযোগ তুলেছেন। উল্লেখ্য, ঘটনাটি ঘটেছে মুসলিম লিগ শাসিত পাঞ্জাব প্রদেশে।

কিন্তু আহমদিয়া সম্প্রদায়ের অভিযোগের প্রেক্ষিতে প্রাক্তন পাক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফ আহমদিয়াদের 'আমাদের ভাই ও বোন' বলে সম্বোধন করায় এবং জঙ্গিদের খুঁজে বের করে খতম করার ডাক দেওয়ায় তাঁর উপর বেজায় চটেছেন বিভিন্ন ইসলামিক সংগঠন ও রাজনৈতিক দলের নেতৃবন্দ। তাঁদের বক্তব্য, "আহমদিয়ারা সংখ্যালঘু অমুসলিম। কাজেই তাদের 'ভাই-বোন' বলে সম্বোধন করা ইসলাম বিরোধী। তাছাড়া তারা বিশ্বাসঘাতক। তাই সহানুভূতি পাওয়ারও অযোগ্য। অতএব, ইসলাম বিরোধী কাজের জন্য নওয়াজ শরিফকে আল্লাহ্ ও পাকিস্তানের মুসলিমদের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে।"

অবশ্য নওয়াজ শুধু আহমদিয়াদের 'ভাই-বোন' বলে সম্বোধন করেই ক্ষান্ত হননি। তিনি এও মন্তব্য করেছেন, "জঙ্গিদের কোনও দেশ, ধর্ম নেই। গোটা দেশকে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। কারণ ওদের জন্যই পাকিস্তানের অস্তিত্ব আজ বিপন্ন।" তিনি আহমদিয়াদেরও দেশের নাগরিক বলে মন্তব্য করেছেন।

ব্যস, মৌচাকে পড়েছে ঢিল। পাক রাজনীতিতেও শোরগোল ফেলে দিয়েছে নওয়াজের ওইসব মন্তব্য। সত্যি বলতে কী, পাক রাজনীতি ইসলামকে বাদ দিয়ে নয়। বরং রাজনীতির মূল ভিত্তিই হচ্ছে ইসলাম। অধিকাংশ পাক নাগরিক ইসলামপন্থী, শরিয়তী আইনে বিশ্বাসী এবং রক্ষণশীল। তাই পাকিস্তানে কোনও ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব নেই। ইসলামপন্থীদেরই রমরমা। পাক সংবিধানে সুন্নী মুসলিম ভিন্ন অন্যান্য মুসলিম সম্প্রদায় যেমন, শিয়া, আহমদিয়া, কাদিয়ানী, সুফি প্রভৃতি অমুসলিম সংখ্যালঘু সম্প্রদায় রূপে চিহ্নিত। যদিও ওইসব সম্প্রদায় ইসলামিক রীতিনীতি ও আচার-অনুষ্ঠান মেনে চলে তবুও তাঁরা ইসলামের শত্রু, অর্থাৎ অমুসলিম।

ইসলামের দৃষ্টিতে অমুসলিমদেরকে 'ভাই-বোন' সম্বোধন নিষিদ্ধ। তাঁরা বিশ্বাসঘাতক, কাফের, সমবেদনা পাওয়ারও অযোগ্য, শত্রু তথা বধযোগ্য। 'জেহাদ' (ধর্মযুদ্ধ)-এর মাধ্যমে 'কাফের' (বিধর্মী)-দের বিনাশ ঘটিয়ে ইসলামিক বিশ্ব বা দুনিয়া হাসিল করাই ইসলামের মূলমন্ত্র। কাজেই সর্বধর্ম-সমন্বয়, বিশ্বমানবতা, সহিষ্ণুতা, সাম্যবাদ ইত্যাদি ইসলাম বিরোধী। ইসলামের তরবারির সামনে নতজানু হতে বাধ্য হয়েছে বহু দেশের অমুসলিমরা। ফলে ওইসব দেশের অধিবাসীদের ধর্ম ও সংস্কৃতি ধ্বংস হয়ে গেছে। সেগুলি এখন পুরোপুরি মুসলিম রাষ্ট্র। যেমন, মেসোপটেমিয়া (ইরাক), পারস্য (ইরান), গান্ধার (আফগানিস্তান), কনস্ট্যান্টিনোপল (তুরস্ক), পূর্ববঙ্গ (বাংলাদেশ), মালয় (মালয়েশিয়া) ইত্যাদি। কোনও মুসলিম দেশে বা মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে অমুসলিমদের বসবাস অসম্ভব। তার প্রমাণ বিভিন্ন মুসলিম দেশে এবং পাকিস্তান, বাংলাদেশ, কাশ্মীরে অমুসলিমদের উপর অমানবিক নির্যাতন। তাই এহেন ইসলাম বিশ্ব থেকে যত শীঘ্র বিনাশ হয় ততই মঙ্গল।

—ধীরেন দেবনাথ, কল্যাণী, নদীয়া।

# ইসলাম ও শান্তি

ইসলাম আর অশান্তি শব্দ দুটি একে অপরের পরিপূরক। ইসলাম ধর্ম-এ কোনও আগ্রহ নেই, কিন্তু ধর্মের পোশাকে শয়তানি কখনই মেনে নেওয়া যায় না। কোনও ধর্ম যদি অন্য ধর্মের মানুষকে সংহার করতে উৎসাহ দেয় তবে তাকে মানব ধর্ম বলা যাবে না।

প্রাণ নিয়ে, সম্মান নিয়ে, নারীদের ইজ্জত নিয়ে যে ধর্ম পৃথিবী জয় করতে চায় সে ধর্মের ধর্মপ্রাণ মানুষরা আসলে ধর্মহীনতায় ভুগছে, তারা ভয় পাচ্ছে এইসব কুকর্মের ইতিহাসকে তারা প্রকৃতপক্ষে কতদিন মানব সভ্যতায় বাঁচিয়ে রাখতে পারবে।

'ধর্ম' আর 'সাম্প্রদায়িক' শব্দ দুটি খুবই প্রচলিত। যদি কোনও ধর্মের কুকর্মের বিরুদ্ধে বলি তবে সাম্প্রদায়িক বলে সমাজে খ্যাতি পাব। ঠিক, কোনও ধর্মের বিরুদ্ধে বলবো না, সাম্প্রদায়িক হবো না, কিন্তু নিজে বেঁচে থাকতে চাই স্বাধীন ভাবে। যদি কেউ বলে হিন্দু হয়ে পৃথিবীতে বেঁচে থাকা যাবে না, আমাকে মুসলমান হতে হবে, তখন কিন্তু আমি সাম্প্রদায়িক হবো।

নিজের হিন্দু ধর্মকে ভালোবাসি, অন্য কোনও ধর্মকে আঘাত করি না। যদি কেউ কোনও ধর্মের সুযোগ নিয়ে হিন্দু ধর্মের ওপর আঘাত করাকে 'জেহাদ' বলে আখ্যা দেয়, তবে সেই ধর্মের বিরুদ্ধে।

বর্তমানে যে ইসলামী সন্ত্রাস মানুষের ওপর দিয়ে বয়ে চলেছে তা একদিন সমস্ত অমুসলমানদের ওপরেও বইবে। নিজেকে বাঁচাতে গেলে, ধর্মকে বাঁচাতে গেলে অবিলম্বে পৃথিবী থেকে জেহাদিদের চিরবিদায় জানাতে হবে।

আমার লক্ষ্য সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধানো নয়, মুসলমানদের হত্যা করা নয়, লক্ষ্য পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। পৃথিবীতে সমস্ত কিছুই মানুষই সৃষ্টি করেছে।

মানব সভ্যতা কোনো জাতের বা ধর্মের গোলাম নয়। মানব সভ্যতাকে বাঁচাতে সমস্ত জাতি ধর্মের মানুষকে এক হতে হবে।

—সঞ্জয় কাহার, কলকাতা।

# মুসলিম শাসন

ভারতবর্ষে মুসলিমের অনুপ্রবেশ আজ থেকে প্রায় ১০০০ বছর আগে। ক্রমে তারা সমগ্র ভারতবর্ষকে নিজেদের অধিকারে আনে এবং প্রায় ৮০০ বছর শাসনও করে। অবশেষে ১৯৪৭ সালে ভারতের এক-তৃতীয়াংশ-কে মুসলিম রাষ্ট্রে পরিণত করে যা বর্তমানে বাংলাদেশ ও পাকিস্তান নামে পরিচিত। অতীতের মুসলিম শাসকদের সঙ্গে আজকের তালিবানীদের অনেকটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়। অতীতের মুসলিম শাসকদের বর্বর অত্যাচারের স্মৃতি ঝাপসা হয়ে গেলেও, আজকের তালিবানী কর্মকাণ্ড যে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করেছে তা বিশ্ববাসীর কাছে আজানা নয়। বিশ্বরাজনীতির চাপে বিশ্বের অধিকাংশ দেশ বা রাষ্ট্র এমনকী ইসলামী রাষ্ট্র একত্রে এই ইসলামী জেহাদের নামে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে। বিশ্বরাজনীতির সুযোগটাকে কাজে লাগিয়ে হিন্দু যদি হিন্দু ভারত গড়ার কথা না ভাবে, তবে মুসলমান সম্প্রদায়ের কাছে হিন্দু এবার চিরতরে গোলামে পরিণত হবে।

—বিজয় দে, ডায়মন্ডহারবার।

# মুসলিম প্রীতি

২৮ জুন স্বস্তিকায় স্বরাজ রঞ্জন ভট্টাচার্যের মমতা ব্যানার্জীর মুসলিম তোষণ প্রসঙ্গে 'রূঢ় বাস্তব' প্রতিবেদনটি অত্যন্ত যুক্তিগ্রাহ্য। মুসলমানদের সঙ্গে নামাজ পড়া, মুসলিমদের সুযোগ সুবিধা দেওয়া তো মুসলিম তোষণেরই নামান্তর। তবে তৃণমূল নেত্রীর মুসলিম ভোট ব্যাঙ্ক তৈরি করার জন্য নিজ ধর্ম, নিজ সংস্কৃতিকে বিসর্জন দেওয়ার ফল হিতে বিপরীত হতে পারে। রাজনীতিজীবী বিশেষ করে কংগ্রেস এবং কমিউনিস্ট দের সংখ্যালঘু তুষ্টিকরণ কোনও নতুন ব্যাপার নয়। কিন্তু তৃণমূলনেত্রী স্বয়ং যদি এই তোষণের রাজনীতির মদতদাত্রী হন তবে আগামীদিনে পালাবদলের ফলে পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের ভবিষ্যত কোন্ পথে এগোবে তা সহজেই অনুমেয়। এসকল তথাকথিত নেতা-নেত্রীরাই আবার জাতীয়তাবাদী সংগঠন আর এস এস, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ মায় বি জে পি-কে পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক আখ্যা দেন। কিন্তু তৃণমূল নেত্রীর মুসলিম প্রীতি কি সাম্প্রদায়িকতা নয়? নিজের ব্রাহ্মণত্ব পরিচয়কে বিসর্জন দেওয়া কি হিন্দু জাতিকে অবমাননা করা নয়? এরপর কি কোরানের নির্দেশমতো তিনি জীবনযাপন করবেন?

তাহলে তো দেখা যাচ্ছে, তথাকথিত নেতা-নেত্রীরাই সাম্প্রদায়িকতাকে প্রশ্রয় দিয়ে রাজ্যে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা বাধাবার নেপথ্যে ভূমিকা নিয়ে থাকেন। ক্ষমতা করায়ত্ত করার বাসনায় মুসলিম ভোটের জন্য এমন লালায়িত হওয়ার মাশুল কিন্তু দিতেই হবে একদিন।

—সমীর কুমার দাস, দ্বারহাট্টা, হুগলী।

# রেলের জমিতে উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সাহসী সিদ্ধান্ত

অসিতবরণ ঠাকুর

রেললাইনের দু'ধারে বহু বৎসরকাল বসবাসকারী উদ্বাস্তু, গরিব ও অবহেলিত মানুষদের রেলের খরচে ফ্ল্যাট করে দিয়ে পুনর্বাসিত করার রেলমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাম্প্রতিক ঘোষণা এক অভিনন্দন যোগ্য সিদ্ধান্ত। সবারই রেলের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানানো উচিত। এতে একটা বহু পুরাতন মানবিক সমস্যার সমাধান হবে। অবহেলিত মানুষগুলো ভালভাবে বেঁচে থাকার, নতুন আশার আলো দেখতে পাবে। নতুন স্বপ্ন দেখতে শিখবে। রেলের গতি, সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন সহজতর হবে। রেলের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন, সুস্থ, স্বাস্থ্যকর ও সুন্দর হবে। যাত্রী সাধারণের যাত্রাপথ মসৃণ ও আনন্দদায়ক হবে। রেল-দুর্ঘটনা ও রেল-অপরাধ অনেকাংশে কমবে।

জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নোংরা, অস্বাস্থ্যকর খুপরি ঘরে ও পরিবেশে মনুষ্যেতর জীবনে অভ্যস্থ হাজার হাজার প্রান্তিক মানুষ স্বভাবত এই ঘোষণায় আনন্দিত ও উৎসাহিত। বহুল প্রচারিত গরীব ও জনদরদী সিপিএম ও তার বামফ্রন্ট সরকার বা অতীতের কোনও রেলমন্ত্রী এদের অমানবিক জীবনযাপনের সমস্যা নিয়ে কোনও ভাবনাচিন্তা করেনি। অথচ সিপিএম ও তার বাম শরিক দলগুলো এই অবাঞ্ছিতদের রাজনৈতিক বা অন্যভাবে যথেচ্ছ ব্যবহার করতে কোনও লজ্জা বা কুণ্ঠাবোধ করেনি। এতদিন ধরে তাদের পুনর্বাসনের আবেদন-নিবেদনে কোন ফলও হয়নি। শেষপর্যন্ত রেলমন্ত্রীর বঞ্চিতদের পুনর্বাসনের মানবিক বিচারের সিদ্ধান্তে আমরা কৃতজ্ঞ।

রেললাইনের ধারে বসবাসকারীদের উচ্ছেদের বিরুদ্ধে ১৯৯৫ সালে কলকাতা হাইকোর্ট এক রিট মামলায় স্থগিতাদেশ দেয়। বিগত ৫ মে ২০১০ এর 'সংবাদ প্রতিদিন'-এ প্রকাশিত এই লেখকের এক নিবন্ধে উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধানে উক্ত মামলাসহ মোট তিনটি মামলার উল্লেখ ছিল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই সময়োপযোগী সিদ্ধান্তের তিনটির মধ্যে একটি সমস্যা ও তৎসংক্রান্ত মামলার নিষ্পত্তি ঘটলো। তাই, ব্যক্তিগতভাবে এবং 'অল ইন্ডিয়া রিফিউজ ফ্রন্টে'র তরফে মমতাদেবীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

আরও যে দুইটি উদ্বাস্তু সমস্যা সমাধান সংক্রান্ত দাবী ও মামলা পড়ে রইল তার মধ্যে "মরিচঝাঁপি গণহত্যার" তদন্তের দাবী সুপ্রিম কোর্টের বিচারাধীন থাকায়, অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু তৃতীয় ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে দাবী তা হলো 'বাংলাদেশী উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্ব না দেওয়ার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের প্রশাসনিক নিষেধের নির্দেশনামা নং ২৬০১১/১৬/ ৭১-আই. সি., তাং ২৯-১১-১৯৭১ বাতিল ঘোষণা করে ২ কোটিরও বেশী নাগরিকত্ব ও নাগরিক অধিকার বঞ্চিত, অসহায় নির্যাতিত, অত্যাচারিত ও শোষিত উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্ব সহ স্থায়ী পুনর্বাসন দেওয়া।' এ সম্পর্কিত আর একটি রিট মামলায় কলকাতা হাইকোর্ট ১৯৯৮ সালে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের উপরোক্ত অন্যায়, বৈষম্যমূলক ও অমানবিক নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে রুল জারি করেছে। মামলাটি এখনও বিচারাধীন।

বাঙালি উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধানে সিপিএম ও তার বাম সরকারের অনীহার কারণ আমরা বুঝি। উদ্বাস্তু সমস্যা সমাধান হয়ে গেলে তাদের শাসন, শোষণ ও প্রভুত্বের জায়গা সংকুচিত হবে। পশ্চিম পাকিস্তানি উদ্বাস্তুদের হয়ে কথা বলার জন্য অনেকে আছে। এন. ডি. এ. আমলে ২০০৪ সালেও নাগরিকত্ব (সংশোধন) বিধি চালু হয়েছে শুধুমাত্র তাদের নাগরিকত্ব দেওয়ার জন্য। কিন্তু বাংলাদেশ থেকে ২৫ মার্চ ১৯৭১ এর পরে আসা বাঙালি উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্ব না দেওয়ার প্রশাসনিক নিষেধাজ্ঞা বাতিলের জন্য কোনও রাজনৈতিক দল, জনপ্রতিনিধি, মন্ত্রী বা রাজ্য সরকার এগিয়ে আসছে না বা দাবী তুলছে না।

বাঙালি মুসলমান অনুপ্রবেশকারীরাই কি তাদের এই অনীহার কারণ? না বাঙালি-বিদ্বেষ বা বর্ণ-জাতপাতজনিত বিদ্বেষই এর কারণ? বোধগম্য নয়। ভারতের সর্বপ্রান্তে ছড়িয়ে থাকা বাঙালি উদ্বাস্তুরা বৈষম্য, অন্যায় ও অমানবিকতার শিকার হয়ে মনুষ্যতর জীবনযাপনে বাধ্য হয়ে আজও ন্যায় বিচারের আশায় আছে।

# সরকারি সহায়তায় মাল্টি স্টেট লঘু উদ্যোগ ক্রেডিট সোসাইটির কর্মী প্রশিক্ষণ

সংবাদদাতা॥ সার্বিক স্বার্থে সুষ্ঠু প্রয়োগই প্রশিক্ষণের প্রকৃত সাফল্য বলে উল্লেখ করলেন মাল্টি স্টেট লঘু উদ্যোগ ক্রেডিট কো-অপারেটিভ সোসাইটি'র পশ্চিমবঙ্গ প্রান্ত সংযোজক প্রবীর পাকিরা। গত ২ জুলাই কল্যাণীর নেতাজী সুভাষ আঞ্চলিক সমবায় ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত কর্মী প্রশিক্ষণের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে এসে তিনি এই মন্তব্য করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার রাজ্য সম্পাদক ওমপ্রকাশ মাইতি, সর্বভারতীয় উপদেষ্টা গোপাল বিশ্বাসসহ আরও অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি।

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে ১০ জন মহিলাসহ ৬৪ জন কো-অপারেটিভ ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ নেন। সরকারি সহায়তায় তথা যৌথ উদ্যোগে এই প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন সরকারি অফিসারসহ সংস্থার পক্ষ থেকেও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রত্যেককে সরকারিভাবেই শংসাপত্র দেওয়া হবে বলে শ্রী মাইতি জানান।

গত কয়েক বছর ধরেই দেশের আটটি রাজ্য (পশ্চিমবঙ্গ, অসম, ওড়িষ্যা, বিহার, ঝাড়খণ্ড, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, দিল্লী) জুড়ে অতি ক্ষুদ্র উদ্যোগপতিদের আর্থিকসহ বিভিন্ন ধরনের সহায়তার জন্য মাল্টি স্টেট লঘু উদ্যোগ ক্রেডিট কো-অপারেটিভ সোসাইটি নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। আগামীদিনে একাধিক শাখা বিস্তারের লক্ষ্যেই সরকারের বিভিন্ন যোজনায় এবং যৌথ উদ্যোগেই এই কর্মী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা বলে শ্রী পাকিরা জানান। এই প্রশিক্ষণ এবং পরবর্তীকালে কার্যক্ষেত্রে প্রবেশ করে সকলের উদ্দেশ্য যাতে ব্যক্তিগত সুখ-ভোগের উর্দ্ধে উঠে সামাজিক তথা রাষ্ট্রীয় সমৃদ্ধির অভিমুখী হয় সে ব্যাপারে আশা প্রকাশ করেন শ্রী বিশ্বাস।

# সমর্পণ

শ্রী রজাহরি

"সমর্পণ'— সমর্পণের বিষয়ে চিন্তা করার সময় কোন্ কোন্ বিশেষ দিকে আমাদের মনযোগ দেওয়া দরকার সেই ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। সেইজন্য কিছু বৈচারিক বিষয় আমি রাখার চেষ্টা করছি।"

### দায়বদ্ধ তা এবং সমর্পণ

আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে একই ধরনের দুটি শব্দ। একটি 'দায়বদ্ধ তা', অন্যটি 'সমর্পণ'। দুটির মধ্যে পার্থক্য কি আছে? সংগঠনের কার্যকর্তা হিসাবে এব্যাপারে আমাদের যথাযথভাবে বুঝতে হবে। দায়বদ্ধ তা বা প্রতিবদ্ধ তার অর্থ হচ্ছে, যে দায়িত্ব আমরা নিয়েছি তা ঠিকমতো নিষ্ঠা সহকারে পালন করা। সমর্পণের স্তর কিন্তু আলাদা। যে কোনও কাজ করার জন্য তিন প্রকারের লোক চাই। উদাহরণ হিসাবে— কোনও কারখানা বা প্রকল্পের কথা বলা যেতে পারে। কারখানায় তিন ধরনের লোকেরা কাজ করে। এক— মজদুর বা শ্রমিক, দুই— কর্মচারী, আর তৃতীয়জন হচ্ছে মালিক। এই তিনজনের দায়িত্বকে কেন্দ্র করেই কোনও কাজ সফল হতে পারে। কিন্তু তিনজনের মানসিক স্তর ভিন্ন প্রকারের। মজদুর, যাকে আমরা ইংরাজীতে লেবার বলি, তার কাজ মূলতঃ শারীরিক। সে বেশি চিন্তা-ভাবনা করে না, যতখানি সম্ভব ততখানিই সে দায়িত্ব সহকারে ও সত্যনিষ্ঠ ভাবে করে। তাকে মালিক তার পারিশ্রমিক দেয়। যতক্ষণ সে মালিকের কাছ থেকে পারিশ্রমিক নেয়, ততক্ষণ দায়িত্ব সহকারে কাজ করে। তার বেশি তার কোনও দায়বদ্ধ তা নেই। অন্য কোথাও যদি আরও বেশি পারিশ্রমিক সে পায় তবে সেখানেই চলে যাবে। মালিককে বলে-কয়েই অন্যত্র চলে যাবে। মালিকও তার মঙ্গল কামনা করে তাকে বিদায় দেয়। এই হচ্ছে শারীরিক স্তর পর্যন্ত দায়বদ্ধ তার স্থায়িত্ব।

এদের উপরে মালিক কাজ সামলানোর জন্য কর্মচারী নিযুক্ত করে। যাকে আমরা Serviceman অথবা Employees বলি। সে কিন্তু Labour নয়। তাকে মজুরী Wage দেওয়া হয় না, তাকে বেতন বা Salary দেওয়া হয়। ওই কর্মচারীর স্তর মজদুরের স্তরের থেকে কিছু বেশি। মানসিক এবং বুদ্ধি র স্তরে সেখানে কাজ হয়। ওই স্তর অনুসারেই সে নিজের পরিচয় দিয়ে থাকে এবং কথাবার্তাও সেই স্তরে বলে। মনে করা যাক, মাহিন্দ্রা কোম্পানির কোনও মার্কেটিং এজেন্ট এল। কথাবার্তা বলার সময় বলল, "I shall supply you two hundred Trucks"। কিন্তু সে সাপ্লাই করার কে? সে কি মালিক? সে কর্মচারী মাত্র, কিন্তু বলার সময় বলে "I shall supply you two hundred Trucks"। আর এই কথা সে দায়িত্বের সঙ্গে বলে। তাকে যদি আরও বেশি বেতন টাটা ইণ্ডিকা দেয় তাহলে সে সেখানেই কাজের জন্য স্বাভাবিকভাবেই চলে যাবে। আর ওই কোম্পানির হয়ে বলবে —"I shall supply you two hundred Cars"। একই দিনে তার দায়বদ্ধ তা মাহিন্দ্রা থেকে টাটা কোম্পানির দিকে চলে যেতে পারে। অর্থাৎ কর্মচারীর প্রতিবদ্ধ তাও শর্তসাপেক্ষ (conditional), অস্থায়ী এবং অস্থির। কিন্তু তার স্তর শারীরিকের উপর মানসিক ও বৌদ্ধি ক স্তর পর্যন্ত সীমিত। কর্মচারীর উপরে থাকে মালিক অথবা MD (Managing Director)। শুধুমাত্র দায়বদ্ধ তা দিয়ে তার কাজ চলে না। দায়বদ্ধ তার উপরও তার এক বিশেষ দায় দায়িত্ব থাকে, এবং তা শরীর বা বুদ্ধি পর্যন্ত সীমিত নয়। কিন্তু তারও উপর বিশেষ এক মনোভাব বা মনোস্থিতি থাকে, যাকে আমরা সমর্পণ বলতে পারি। এই জন্য দায়বদ্ধ তা ও সমর্পণ দুটি ভিন্ন বিষয়।

### সমর্পণ এবং জীবনব্রত

যেমন দায়বদ্ধ তা ও সমর্পণ ভিন্ন শব্দ, তেমনই সমর্পণ ও জীবনব্রত এই দুটিও আলাদা শব্দ। যার অর্থ ও তাৎপর্য একে অন্যের থেকে আলাদা। সেকথাও আমাদের ভালভাবে বুঝতে হবে। আমরা সবাই ধ্যেয়বাদী বা আদর্শবাদী। আমাদের সামনে রয়েছে এক বিশেষ গন্তব্য ও লক্ষ্য। সেই পর্যন্ত পৌঁছানোই হচ্ছে আমাদের কাম্য। এইজন্য আমরা সবসময় চিন্তাও করতে থাকি এবং সেই অনুযায়ী জীবনকেও রচনা করার চেষ্টা করি। প্রয়োজন অনুসারে পরিবর্তনও করে থাকি। ধ্যেয়ানুরূপ আচরণ জীবনে আগ্রহপূর্বক করার প্রয়াস থাকে। ধ্যেয়ের জন্যই জীবনে অনেক বিধিনিষেধ আমরা স্বীকার করি।

সমর্পণ কিন্তু এর থেকেও অন্য কিছু। সমর্পণে আমাদের জীবনের গতিপ্রকৃতি লক্ষ্যের অভিমুখী হয়। ধ্যেয়ের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার জন্য জীবনকে ধ্যেয়ের দিশার দিকে প্রবাহিত করতে করতে ওই ধ্যেয়তেই বিলীন হয়ে যাওয়াই সমর্পণ। অর্থাৎ এককথায় ধ্যেয়কে নিজেদের জীবনে প্রবৃত্ত করা হচ্ছে ব্রত, আর জীবনকে ধ্যেয়তে প্রবাহিত করা হচ্ছে সমর্পণ। এজন্য সাধারণভাবে আমরা বলে থাকি 'ব্রত স্বীকার করেছি', আর 'সমর্পণ করে দিয়েছি।'

### সমর্পণ কোনও আংশিক বস্তু নয়

সমর্পণের কথা বলার সময়েও মনে রাখতে হবে, সমর্পণেরও স্তর অনেক ও বিভিন্ন প্রকারের হয়। আমরা প্রার্থনাতে বলেছি, 'পতত্বেষ কায়ো'— অর্থাৎ শরীর কাজে লাগুক। এটা একটা সাংকেতিক শব্দ মাত্র। এর অর্থ শুধুমাত্র শরীর পর্যন্তই সীমিত নয়। 'আমার শরীর কাজে লাগছে' বললে তার অর্থ শুধু শরীর পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয়। শরীর তো সমগ্র জীবনের এক জীবন্ত জাগ্রত পরিদৃশ্যমান প্রতীক মাত্র। যেমন এক স্থানে কবি কালিদাস বলেছেন— শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম সাধনম্— অর্থাৎ ধর্মের সাধন মূলতঃ শরীর, কিন্তু তার অর্থ কী শুধু শরীর পর্যন্তই সীমিত? আত্মার কি কোনও ভূমিকাই নেই? বুদ্ধি র কোনও প্রাধান্য নেই কি? কালিদাস বলেছেন বলেই কি শরীরের যা কিছু প্রাধান্য? এটা তো একটা প্রতীকমাত্র। সেজন্য আমরা যখন বলি, 'পতত্বেষ কায়ো নমস্তে নমস্তে', তা কেবল শরীর পর্যন্ত সীমিত নয়, বরং পুরো জীবনের বিভিন্ন স্তর পর্যন্ত সমর্পণের স্তর বিস্তৃত। কেবলমাত্র পঞ্চ ভূত আধারিত শরীর পর্যন্ত সীমিত কখনোই নয়। শরীরের ভেতরেও অনেক স্তরে তা ব্যাপৃত, সেই পর্যন্ত আমাদের সমর্পণের ভাব জাগাতে হবে, সে ব্যাপারে আমাদের চিন্তা করতে হবে।

### সর্বস্ব সমর্পণের প্রার্থনা

এ ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করার সময়, একটি ছোট্ট প্রার্থনা মনে পড়ছিল।

*।। শ্রীগুরু পূর্ণিমা উপলক্ষে প্রকাশিত।।*

**"সমর্পণে আমাদের জীবনের গতিপ্রকৃতি লক্ষ্যের অভিমুখী হয়। ধ্যেয়ের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার জন্য জীবনকে ধ্যেয়ের দিশার দিকে প্রবাহিত করতে করতে ওই ধ্যেয়তেই বিলীন হয়ে যাওয়াই সমর্পণ।"**

ওই প্রার্থনাটি হচ্ছে—

"কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্বা,
বুদ্ধ াত্মনা বা প্রকৃতিস্বভাবাৎ
করোমি যদ্যৎ সকলং পরস্মৈ।
নারায়ণায়েতি সমর্পয়ামি।।"

— অর্থাৎ হে ভগবান! যা কিছু আমি শরীর, মন, বাণী, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি, আত্মা ও প্রকৃতির স্বভাবের দ্বারা করে থাকি, তা সবকিছুই তোমার শ্রীচরণে সমর্পণ করছি।

### শারীরিক সমর্পণ

সমর্পণ তাহলে কত প্রকারের হয়ে গেল? সর্বপ্রথম বলা হয়েছে, 'কায়েন' অর্থাৎ শারীরিক সমর্পণ। এখানে 'কায়েন' শব্দের অর্থ পঞ্চ ভূত আধারিত শরীর পর্যন্ত সীমিত। কিন্তু এই সমর্পণ সাধারণ একজন মজদুর ও কর্মচারীও করে থাকে। সুতরাং এসবই দায়বদ্ধ তার স্তরেই থাকে। শুধুমাত্র শরীর দিয়ে কাজ হবে না, আমাদের এরও ভেতরে প্রবেশ করতে হবে।

### বাণী সমর্পণ

'বাচা'— অর্থাৎ বাণী সমর্পণ, তা কী? এ ধরনের কোনও সমর্পণ আছে কী? নিশ্চ য় আছে। এর জন্য বাক্ অথবা বাণীর প্রকৃত অর্থ আমাদের জানতে হবে। বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ এবং প্রথম বৈয়াকরণিক পাণিনি বাণীর উৎস বা উদ্গমের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন—

"আত্মা বুদ্ধ্যা সমেত্যার্থান্, মনো যুঙ্‌ক্তে বিবক্ষয়া।"

— এর অর্থ হচ্ছে, যখন আন্তরিকভাবে কিছু বলতে হয়, তখন নিজের বুদ্ধি দিয়ে বলার সময় ওই বিষয় সম্বন্ধিত সমস্ত তাৎপর্য, অর্থ, ভাব ইত্যাদি যুক্ত করেই বলতে হয় এবং সেই অনুসারে মনকেও প্রেরণা দিতে হয়। তখনই বাণীর সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ বাণী মা
পেছনে অর্থবাহী হেতু বা কারণ
হবে। তখনই কেবলমাত্র আমর
সমর্পণের বিষয়ে কিছু বুঝতে পার
বলি। আমাদের বাণী কেমন বে
ভাবতে হবে যে, আমাদের কি
তৈরি করি। সেই অনুসারে সূচনা, আজ্ঞা ইত্যাদিও দিয়ে থাকি। অর্থাৎ আমাদের মুখ থেকে সেরূপ শব্দই বের হয়। ধ্যেয়বাদী ব্যক্তির বাক্য সমর্পণের উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

প্রথম সঙ্ঘ প্রতিবন্ধের সময়ের কথা। পূজনীয় শ্রীগুরুজী সঙ্ঘের কাজ স্থগিত করে দিয়েছেন এবং প্রতিবন্ধ তুলে নেওয়ার জন্য শ্রীগুরুজী সরকারের সঙ্গে পত্রালাপ ইত্যাদি শুরু করেছেন। প্রকৃত অর্থে সেই সময় পূজনীয় গুরুজীর কেউ সহকারী ছিলেন না। কারণ সঙ্ঘই তো ছিল না। কিন্তু সরকারকে পত্র লেখার সময় পূজনীয় শ্রীগুরুজী সর্বপ্রথম একটি বাক্য লিখলেন— "I and my former co-workers....(তার পরের বাক্য কী তা আমাদের এখানে প্রয়োজন নেই) I and my former co-workers অর্থাৎ আমরা সকলে একটি টিমের মতো কাজ করি। অন্যরা আমার ওয়ার্কার নয়, তারা সবাই আমার co-workers সহযোগী। কিন্তু এখন আর তারা আমার কো-ওয়ার্কার নয়, কারণ কাজ স্থগিত আছে,তবুও 'সমেত্য বুদ্ধা'। গুরুজীর অন্তরাত্মা কি বলেছিল, তাঁর মনে কি ভাব ছিল? and my former co-workers এই হচ্ছে বাণী সমর্পণ। এক একটি শব্দের পেছনে কত গভীর চিন্তা! যখন আমার মনে এই বোধশক্তি আসে যে, আমাকে সঙ্ঘের কাজ করতে হবে, তখন আমার বুদ্ধি বলে দেয় আমাকে কোন্ শব্দ ব্যবহার করতে হবে। অর্থাৎ বাণীরও বিধিনিষেধ সম্পর্কে খেয়াল থাকা দরকার। পূজনীয় ডাক্তারজীর জীবনেও এর উদাহরণ আমরা পাই। মহিলাদের বিষয়ে বলতে গিয়ে একজন দায়িত্বশীল স্বয়ংসেবক শব্দ ব্যবহার করলেন 'রমণী'। অমরকোষ (ডিক্সিনারি) অনুসারে রমণীর অর্থ মহিলা। কিন্তু পূজনীয় ডাক্তারজী বললেন, 'সঙ্ঘের মধ্যে এধরনের শব্দ ব্যবহার চলে না। মাতা বা ভগিনী বলো, কিন্তু রমণী শব্দ চলে না।' মহিলা শব্দের অর্থ অন্য কিছু। পূজনীয় ডাক্তারজীর মনে এই চিন্তা কেন এল যে, রমণী শব্দটি ঠিক নয়! অর্থাৎ 'সমেত্য বুদ্ধা মনোযুঙ্‌ক্তে' চিন্তা করার সময় রমণী শব্দ খাপ খায় না। উপরোক্ত দুটি উদাহরণই আমাদের জন্য যথেষ্ট যে, বাণী সমর্পণের অর্থ কী।

### মনের সমর্পণ

সমর্পণ মানসিক স্তরেও হয়। আমরা আমাদের প্রতিজ্ঞাতে বলেছি যে সঙ্ঘের কাজ তন-মন-ধন দিয়ে করবো। এর দ্বারাই মনের সমর্পণের বিষয়টা স্পষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু এই মনের সমর্পণ আমরা আমাদের জীবনে স্বীকার করি কি? দীনদয়ালজীর উদাহরণ নেওয়া যাক। দীনদয়ালজীর সমস্ত জীবন রচনা ছিল অরাজনৈতিক। দীনদয়ালজী যিনি সহ-প্রান্তপ্রচারক ছিলেন, তাঁকে শ্রীগুরুজী ডেকে বললেন, 'তুমি ভারতীয় জনসঙ্ঘের কাজে যাও।' যেমন ভগবান শ্রীরামচন্দ্র বনবাসে চলে গিয়েছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে তিনিও ভারতীয় জনসঙ্ঘের কাজে বেরিয়ে পড়লেন, অনায়াসে, বিনা দ্বিধায়। একেই বলে মানসিক সমর্পণ। আর এক মাননীয় সঙ্ঘাধিকারী বললেন, "আমি তো অনুশাসিত স্বয়ংসেবক, আজ পর্যন্ত সঙ্ঘের আজ্ঞা আমি পালন করে আসছি। 'যদিও' এই শব্দের পর কি আসবে, সেকথা আমরা সবাই বুঝতে পেরেছি। এই 'যদিও', 'পরন্তু', 'কিন্তু' ইত্যাদির পর স্থানান্তরিত ব্যক্তি মনের বিরুদ্ধ মানসিকতা নিয়ে মনের বিপরীত নতুন দায়িত্ব স্বীকার করে। এটা মানসিক সমর্পণ নয়।

আমাদের এতো বড় সংগঠন, যা কেবলমাত্র সঙ্ঘস্থানে সীমিত নয়, কাঠামো আধারিত সংগঠন নয়। এ হিন্দুত্বের এক ক্রমবর্ধিষ্ণু আন্দোলন।

*(এরপর ১৩ পাতায়)*

## আলাপচারিতায় সঙ্গীতশিল্পী নির্মলা মিশ্র

# শ্রোতাই আমার ভগবান, তাদের ভালবাসাই বড় পুরস্কার

*বিংশ শতাব্দীর পাঁচের দশকে অর্থাৎ '৫৬ সাল থেকে আকাশবাণীর বেতার তরঙ্গে, এইচ এম ভি-র রেকর্ড বাজনায় আধুনিক গানের জগতে একটি সুললিত কণ্ঠ শ্রোতাদের মুগ্ধ করে তোলে। কিন্তু যার কণ্ঠ, সে ছিল কিশোরী। সে জানতে পারত না, বুঝতে পারত না যে তার এই কণ্ঠ শ্রোতৃসমাজে এতটাই সমাদৃত। ধাপে ধাপে সময়ের তালে আজও অর্থাৎ একবিংশ শতাব্দীতেও সেই কণ্ঠ একইভাবে শ্রুতিমধুর— তিনি হলেন আমাদের জনপ্রিয় গায়িকা নির্মলা মিশ্র। কেমন আছেন, কীভাবে এখনও এমন কণ্ঠলাবণ্যের অধিকারিণী, গান কিভাবে শেখা, তার অনুশীলন, বর্তমান প্রজন্মদের জন্য তাঁর কিছু মতামত এসবই উঠে এল স্বস্তিকার পক্ষে ইন্দিরা রায়-এর সঙ্গে ঘরোয়া আলাপচারিতায়।*

শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের পরিমণ্ডলে নির্মলা মিশ্রের জন্ম এবং বেড়ে ওঠা। বাবা ছিলেন শাস্ত্রীয় সঙ্গীত জগতের স্বনামধন্য পণ্ডিত শ্রী মোহিনীমোহন মিশ্র। মেজদা ছিলেন সুরের জাদুকর মুরারীমোহন মিশ্র এবং সেজদা কানু মিশ্র। ভাই-বোনেদের মধ্যে তিনি ছিলেন শ্রুতিধর—বলা যায়, সরস্বতীর আশীর্বাদধন্যা। যার জন্য তাঁকে কখনও রেওয়াজ করতে হয়নি। হাতে ধরে গান শিখতে হয়নি। শুনে শুনে কণ্ঠে তা সুর হয়ে গীত হোত। আজও তাই। শিশুবেলা থেকেই এই যে গানের সুরের প্রতি আগ্রহ—এটাই ভবিষ্যতের 'নির্মলা মিশ্র'তে পরিণত করেছে। ছোটবেলায় কীভাবে গানের জগতে আসা প্রশ্নের উত্তরে তাঁর সাবলীল জবাব ঃ শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের পরিবারে জন্মেছি। বাবা সব রকমের তারের যন্ত্র বাজাতেন। নিজে 'সুরমণ্ডল' সৃষ্টি করেন। শুনে শুনে বেড়ে উঠেছি। বাবা রেওয়াজ করতেন। আমার বাবার সম্পর্কে একটু বলি। বাবা ছিলেন সঙ্গীতসাধক পণ্ডিত শ্রী মোহিনীমোহন মিশ্র। কাশী সঙ্গীত সমাজ থেকে উনি তিনটে উপাধি পেয়েছিলেন— সঙ্গীত নায়ক, সঙ্গীত রত্ন ও পণ্ডিত। এছাড়া, আমার মেজদা মুরারীমোহন মিশ্র খুব ভাল শাস্ত্রীয় সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। খুব অল্প বয়সে মারা যান। অনেকে বলেন— আমিই নাকি সেই 'মেজদা' হয়ে এসেছি। এছাড়া, আমার সেজদা কানু মিশ্রও খুব অভিজ্ঞ শাস্ত্রীয় তবলিয়া ছিলেন। বাড়িতে বাবার কাছে সে সময়কার বিখ্যাত শাস্ত্রীয় শিল্পীরা আসতেন— যেমন, বড়ে গোলাম আলি খাঁ, গাঙ্গুবাঈ হাঙ্গেল, আমির খাঁ, তারাপদ চক্রবর্তী, আল্লারা খাঁ, শান্তাপ্রসাদ প্রমুখ। গোলাম আলি খাঁ সাহেবের কোলে বসে কত গান করেছি। এইভাবেই আমার গানের জগতে আসা।

জনসমক্ষে কবে আপনার গানের প্রথম প্রকাশ হয়, এ প্রসঙ্গে জানালেন,—আমার মেজদা মুরারীমোহন মিশ্রর মৃত্যুর পরে বাবা তাঁর স্মৃতিতে 'মুরারীস্মৃতি বার্ষিকী প্রতিযোগিতা ও সঙ্গীত সম্মেলন' চালু করেন। তার আগে চালু ছিল 'অল বেঙ্গল কম্পিটিশন ও কনফারেন্স'। পরে অবশ্য এই কম্পিটিশন ও কনফারেন্সের উদ্যোক্তা দামোদর খান্না বেরিয়ে এসে বাবার অনুমতি নিয়ে শুরু করলেন 'অল ইন্ডিয়া মিউজিক কনফারেন্স'। মাত্র দশ বছর বয়সে কম্পিটিশন-এ গান গেয়ে তিন বছর পরপর ফার্স্টক্লাস ফার্স্ট হই। এই আমার প্রথম বাইরে গাওয়া।

শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের সব দিকেই পারদর্শী হওয়া সত্ত্বেও আপনি কেন আধুনিক গানে এলেন,— জানালেন ঃ ছোটবেলায় ছ' ছবার টাইফয়েড হয়েছিল। তখন তো সেরকম চিকিৎসাব্যবস্থা ছিল না। এর ফলে আমার চোখ নষ্ট হয়ে গেল। হার্টের প্রবলেম দেখা দিল। গানবাজনা বন্ধ হয়ে গেল। আমার সেজদা খুব ভাল তবলিয়া ছিলেন। বাবাকে বললেন, আপনি অনুমতি করুন, ওকে আধুনিক গানে তৈরি করি। বাবা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হলেন। শাস্ত্রীয় সঙ্গীত ছেড়ে আধুনিক গান— কখনওই নয়। সেজদা বোঝালেন— সব গানেই সা রে গা মা পা ধা নি লাগছে। এই সাতটি স্বর বাদ দিয়ে তো কোনও গান হয় না। সুতরাং আধুনিক গান না করার মানে কি? এই কথা শুনে বাবা রাজি হয়েছিলেন। সেই আমার আধুনিক গানের জগতে আসা। এ ক্ষেত্রে আমার গুরু বলা যায় জগন্ময় মিত্র, নচিকেতা ঘোষ। নচিদার কাছে শিখিনি, কিন্তু আমি ওনাকে 'গুরু' হিসেবে জানতাম। আরও অনেকেই ছিলেন।

প্রথম আকাশবাণী ও এইচ এম ভি-তে গান করেন কবে?

'৫৬ সালেই আমার প্রথম রেকর্ড দুটি আধুনিক গানের—ধূসর গোধুলি (শৈলেন মুখার্জির সুর), মনে আমার ফাগুন এল। আকাশবাণীতে বাবার সুরে ভজন আর জগন্ময় মিত্রের সুরে আধুনিক গান 'তার সজল চোখে কাজল ছিল না'।

দীর্ঘ সঙ্গীত জীবনে প্রচুর গান করে শ্রোতাদের মুগ্ধ করেছেন। তার মধ্যে 'এমন একটি ঝিনুক খুঁজে পেলাম না' অধিকাংশ শ্রোতার মন জয়কারী গান— আপনারও কি

তাই মনে হয়?— 'না আমার সবচেয়ে প্রিয় গান 'ও তোতা পাখি রে'। এই গানটা প্রথম আমি শুনেছিলাম সঙ্গীতশিল্পী পূরবী দত্তের গলায়। গানটা এত ভাল লেগেছিল যে খোঁজ নিয়ে জানলাম এই গানটা কার। জানলাম প্রবীর মজুমদারের। ওনাকে বলে জিদ করে এই গানটা আমি রেকর্ড করি। আজও আমি অনুষ্ঠানে শেষ গান হিসেবে এই গান করি। শ্রোতাদের চোখে জলও দেখতে পাই।

সঙ্গীত জগতে আপনার স্মরণীয় ঘটনা কি— এ ব্যাপারে বলতে গিয়ে মন চলে গেল ফিরে দেখা অতীতে। বললেন— আমার তখন ছ' সাত মাস বয়েস। বাবা ভোরবেলা উঠে বারান্দায় পায়চারি করতেন, বিভিন্ন সুর ভাঁজতেন দেশলাই বাক্সের ওপর টোকা মেরে। টকটক আওয়াজ শুনে আমিও জিভ নাড়তাম। আবার শব্দ বন্ধ হলে আমার জিভ নাড়া বন্ধ হয়ে যেত। তখনই বাবা বুঝেছিলেন যে আমার মধ্যে একটা আলাদা জন্মগত সুর তাল বোধ আছে।

আরেকবার দশ বছর বয়সে অল বেঙ্গল মিউজিক কম্পিটিশন ও কনফারেন্সে গান করার ইচ্ছা প্রকাশ করতেই বাবা বলেছিলেন— অসম্ভব। গান না শিখে কী করে তা হতে পারে। বাবা রাজি হলেন না। আমার খুব ইচ্ছে দেখে মা বাবাকে বারবার অনুরোধ করেছিলেন। শেষে বাবা বলেছিলেন— আমি গান শেখাতে পারব না। একবার শোনাব। শুনে শিখে নিতে হবে। হলোও তাই। পরের দিন ভোরবেলা গানটা মনে মনে করতে লাগলাম। হারমোনিয়ামে রেওয়াজ করতে লাগলাম। বাবা আমার গান

*(এরপর ১৪ পাতায়)*

## ।। চিত্রকথা ।। পরশুরাম।। ৩

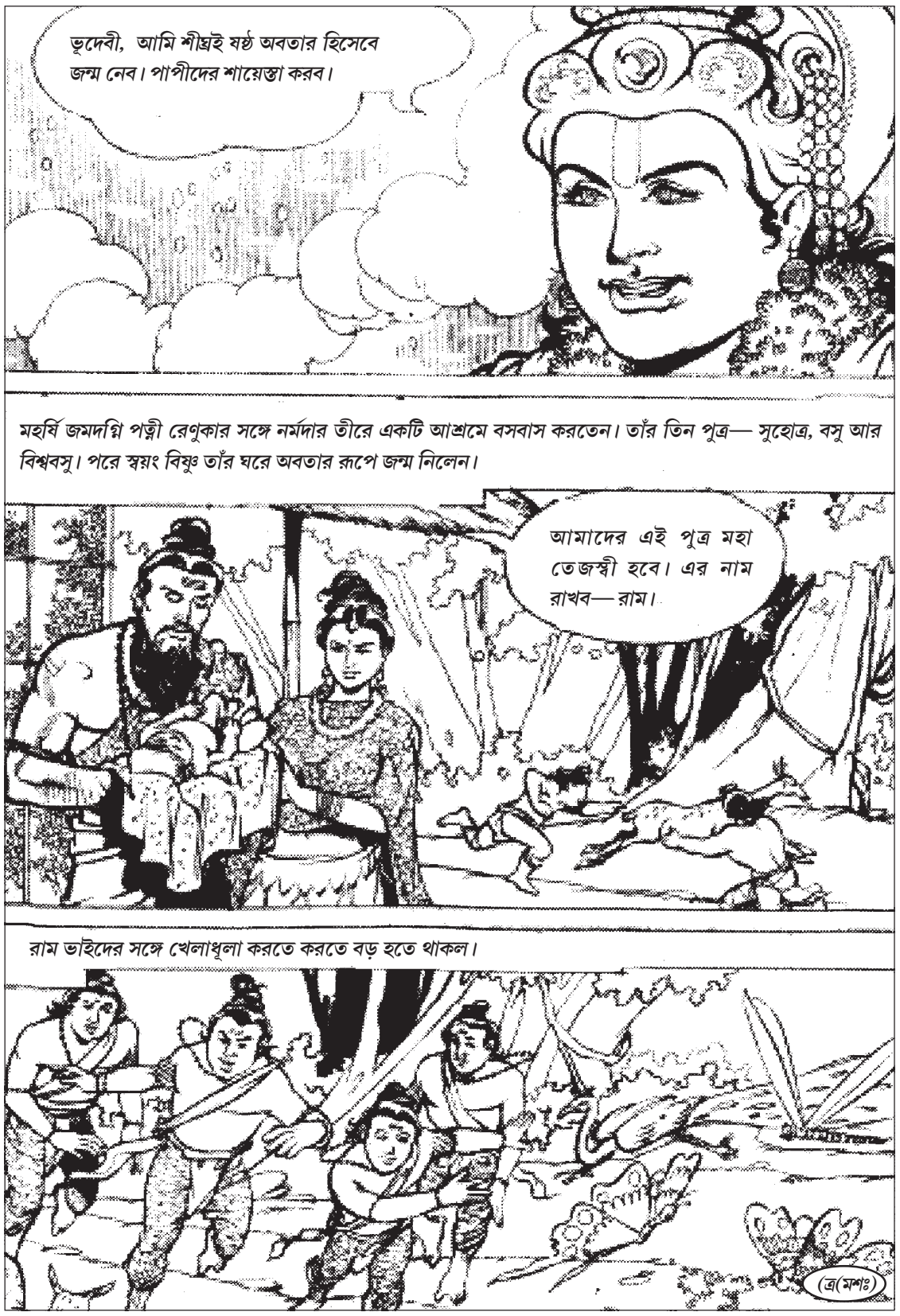

# ধ্যেয়তে একাত্ম হওয়াই সমর্পণ

> ঈশামসিহা অত্যন্ত সুন্দর জবাব দিলেন। ঈশামসিহা বললেন, "আমি যদি পড়ে যাই তো ভগবান অবশ্যই আমাকে বাঁচাবেন। কিন্তু নিজের থেকে যদি জোর করে লাফ মারি তাহলে ভগবান আমাকে কখনও বাঁচাবেন না।" আমি পড়ে গেলে ভগবান অবশ্যই উদ্ধার করবেন। এই ধরনের ভাবই আসলে সমর্পণ। এই ধরনের সমর্পণেই পৌরুষ আছে, চরিতার্থতা আছে, কর্তৃত্ব আছে।

*(১১ পাতার পর)*

এই আন্দোলনে ভিন্ন ভিন্ন শাখা আছে। ভিন্ন ভিন্ন দিক এবং ক্ষেত্র আছে। সেসব জায়গায় যখন আমাদের কাজ করতে পাঠানো হয় সেখানে যাওয়া আমাদের কর্তব্য। এই দায়িত্ব পালনের জন্য শুধুমাত্র শরীর বা বাক্য সমর্পণ হলেই হবে না। মনেরও সমর্পণ চাই। আমাদের মধ্যে এমন কি আছে? সমর্পণের বিষয়ে ভাববার সময় এইসব ব্যাপারে বিষদ চিন্তা-ভাবনা করার দরকার। যদি আমরা ঠিকভাবে চিন্তা করি বরিষ্ঠ অধিকারীদের ভাববার কাজও কত সরল হয়ে যায়। যেখানে খুশি পাঠান— এটা বলা যত সোজা, মানসিক সমর্পণ না হলে তা করা অত্যন্ত কঠিন। শুধুমাত্র অনুশাসনের দোহাই দিয়ে বাধ্য হয়ে করা, তা সঠিক অর্থে কখনও সমর্পণ নয়।

**বুদ্ধির সমর্পণ**

মনের সমর্পণের মতো বুদ্ধির সমর্পণও মহত্বপূর্ণ। তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের এ বিষয়ে বিশেষভাবে সচেতন থাকতে হবে। শ্রীগুরুজী আমাদের যে বৌদ্ধিক তত্ত্ব দিয়েছেন সেসব ভুলে গিয়ে কিছু কিছু লোক নিজেদেরকে সঙ্ঘের বড় thought giver মনে করে। অমুক অমুক আর এস এসের থিঙ্ক ট্যাঙ্ক— এরূপও বলা হয়। কিন্তু বুদ্ধির সমর্পণ সম্পর্কিত ভাব সঠিক ভাবে বুঝতে হবে। বুদ্ধি সম্পর্কিত সমর্পণ কি? মাত্র দুটি উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে। আমরা সকলেই ১৯৩৯ সালের সিন্দী বৈঠকের বিষয়ে শুনেছি। ওই বৈঠকে প্রার্থনার নবীকরণের প্রসঙ্গ এল, আপ্পাজী যোশী এবং শ্রীগুরুজীও বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। দুজনের মধ্যে গরম তর্ক-বিতর্ক শুরু হল, দুজনেই কট্টর। নিজের নিজের মতে অবিচল। ওই সময়ের প্রথা ছিল, আজও আছে, এরকম অবস্থাতে রায় পূজনীয় সরসঙ্ঘচালকজী দেবেন। পরম পূজনীয় ডাক্তারজী গুরুজীর যে মত ছিল তার বিপরীত রায় দিলেন। তিনি আপ্পাজীর পক্ষেও রায় দিলেন না। কারুর পক্ষ নয়, জয় হল সত্যের। শ্রীগুরুজীর হারও হল না আর আপ্পাজীর জয়ও হল না। এরকমই সঙ্ঘে হয়ে থাকে। এখানে হামেশা সত্যেরই জয় হয়, সঙ্ঘরূপী সত্যের জয়। যদিও কথা তো আপ্পাজীরই মানা হল। যেন কোনও বাদ বিবাদই হয়নি এমনভাবে সব ঘটনা মন থেকে শ্রীগুরুজী মুছে ফেলে পরবর্তী বৈঠকের বিষয়ে খুশি মনে যোগ দেন। শ্রীগুরুজী কোন্ ধাতুর তৈরি ব্যক্তি ছিলেন! শ্রীগুরুজী হাজারো গ্রন্থ অধ্যয়ন করেছেন যেন— intellectual giant, বুদ্ধির বিশাল কায়াস্বরূপ ছিলেন। তাঁর মধ্যে অগাধ আত্মবিশ্বাস ছিল। স্মরণশক্তিও ছিল অপ্রতিম। তুলনায় ডাক্তারজীর পাণ্ডিত্য নগণ্য ছিল। কিন্তু ডাক্তারজী ছিলেন সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা, অন্তর্বাহ্য জ্ঞাতা। এইসব জেনে শুনে গুরুজী সমস্ত যুক্তিতর্ক ডাক্তারজীর চরণে সমর্পণ করেছেন এবং সবশেষে নত মস্তকে তাঁর সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছেন।

দ্বিতীয় উদাহরণ, লোকমান্য তিলকের। ওই সময় জ্যোতিষ ও গণিত শাস্ত্রে বিশ্বের দশজনের মধ্যে অন্যতম ছিলেন লোকমান্য তিলক। তিনি গ্রন্থও রচনা করেছিলেন। Arctic Home in the Vedas ও Orion— এই দুটোই ছিল জ্যোতিষ শাস্ত্র বিষয়ক। ওই বইগুলি পড়ে জার্মানীর এক বিখ্যাত অধ্যাপক তিলকজীকে বললেন— 'তিলকজী, আপনি যদি গণিতের অধ্যাপক হিসাবে কাজ করেন তাহলে দেশের কাজও করতে পারবেন। গণিত শাস্ত্রে আপনার প্রয়োজনও অনেক বেশি।' লোকমান্য তিলক নিশ্চিন্ত মনে বললেন, 'ভবিষ্যতে আমার চেয়েও অনেক দক্ষ গণিত শাস্ত্রবিদ্ হয়তো হবেন, কিন্তু আজকের প্রয়োজন দেশকে স্বাধীন করার আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার। এইজন্য আমি সেই কাজই করব।' নিজের ইষ্ট বিষয়কে 'রাম, রাম' বলে বিদায় দিয়ে দেশমাতার জন্য জীবন সমর্পণ করলেন। পরবর্তী বংশধরেরা জানতেই পারল না যে তিলকজী গণিতের একজন বিরাট পণ্ডিত ছিলেন। এই ধরনের সমর্পণকে আমরা কোন্ সমর্পণ বলব? এ হচ্ছে বুদ্ধি সমর্পণ। আমাদের বুদ্ধির সমর্পণও চাই।

আমাদের মধ্যে অনেকেই বুদ্ধি সমর্পণে হেরে যান। স্বামী বিবেকানন্দ যখন পাশ্চাত্য থেকে দেশে ফিরে আসেন, তখন তাঁর কার্যভার নেওয়ার জন্য, কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য উপযুক্ত এক গুরুভাইকে আমেরিকা পাঠান। ওই গুরুভাই আমেরিকা যান এবং সেখানে অনেক কাজও করেন। সেখানকার পরিবেশ ও ভক্তদের কাজে প্রভাবিত হয়ে তিনি ফিরে আসেন। ভারতে ওই সময় স্বামী অভেদানন্দ, যাঁর প্রেরণাবাক্য ছিল — 'মানবসেবা - মাধব সেবা'। সেবার মাধ্যমে কাজ দ্রুতগতিতে বাড়তে থাকে। আমেরিকা ফেরৎ স্বামীজী এই সেবার ব্যাপারে একমত ছিলেন না। তাঁর মতে সেবাতে কাজ হবে না। বৈদান্তিক ক্রান্তি চাই, এবং তার মাধ্যমেই একমাত্র সনাতন ধর্মের প্রসার হবে। কিন্তু স্বামী অভেদানন্দ তাঁর মতে এতোই কট্টর ছিলেন যে, শেষ পর্যন্ত রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম generation - য়েই রামকৃষ্ণ আশ্রমের বেলুড় মঠ থেকে তিনি আলাদা হয়ে গেলেন। বুদ্ধি সম্পর্কিত আলাদা সংস্থা তিনি তৈরি করেন। বুদ্ধি সমন্বিত সমর্পণে এই মহাত্মা একপ্রকার হেরে গেলেন।

**এরূপ আর একটি উদাহরণ**

আর একজন সন্ন্যাসী ছিলেন। তিনিও শ্রীরামকৃষ্ণ শিষ্য মণ্ডলীর অন্যতম ছিলেন, তিনি কাজের জন্য দক্ষিণ ভারতে গিয়ে স্থানে স্থানে অনেক আশ্রমের স্থাপনা করলেন। ব্যাঙ্গালোর ও তিরুঅনন্তপুরমে আশ্রমের স্থাপনা করলেন। কিন্তু একটি সামান্য বিষয় নিয়ে তাঁর মতভিন্নতা হল। মামলা আদালত পর্যন্ত গড়াল। শুনানি হল। শেষে রায় বেলুড়মঠের পক্ষেই গেল। ফলে সন্ন্যাসীকে বেলুড় মঠ ছাড়তে হল। পরবর্তীকালে কেরলে তাঁর জীবনাবসানও হয়।

কেন এমন হল? এই দুই সাধুই তো সর্বসঙ্গ পরিত্যাগী। শ্রীরামকৃষ্ণর বরদহস্ত এঁদের মাথায় ছিল। কিন্তু তবুও কেন এমন হল? বুদ্ধি সম্পর্কিত সমর্পণ যা কিনা আমরা পূজনীয় শ্রীগুরুজী, লোকমান্য তিলকজীর মধ্যে দেখতে পাই, তা এখানে দেখতে পাওয়া গেল না। অনেকে আছেন, যাঁরা হয়তো অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন বা পড়েছেন। কিন্তু আমাদের বুদ্ধি সম্পর্কিত সমর্পণ যদি না হয়ে থাকে, তাহলে আমাদের দশাও ওই দুই সাধুর মতো হবে, যাঁরা নিজেদের মাতৃ সংগঠন পর্যন্ত ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন।

**ইন্দ্রিয়ের সমর্পণ**

ইন্দ্রিয়ের সমর্পণ মানে কি? এই বিষয়ে বেশি কিছু বলার দরকার নেই। আমরা সবাই বুঝি। এককথায় বলা যেতে পারে, শারীরিক তপস্যা চাই। শ্রীমদ্ভগবৎ গীতাতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তিন প্রকার তপস্যার কথা বলেছেন— শারীরিক তপস্যা, বাচিক তপস্যা ও মানসিক তপস্যা। এই বিষয়ে আমরা একটু চিন্তা করি। শ্রীকৃষ্ণ যে শারীরিক তপের কথা বলেছেন, তাতে ব্রহ্মচর্যের কথা বলা হয়েছে। 'ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে'। এই ব্রহ্মচর্যকে শারীরিক তপে কেন সমাবিষ্ট করা হয়েছে, তার উত্তর ইন্দ্রিয়ের সমর্পণ— ব্যাস এই পর্যন্তই। এ বিষয়ে এর বেশি আর বলার প্রয়োজন নেই। আমাদের উপরই তা চিন্তা-ভাবনা করার জন্য ছেড়ে দেওয়া হল। ইন্দ্রিয়ের সমর্পণও চাই। হাত-পা, কর্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয় ইত্যাদি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কাজের সমর্পণ চাই ধ্যেয়র জন্য।

**জন্মজাত স্বভাবেরও সমর্পণ**

এইভাবে 'প্রকৃতি স্বভাবাৎ'— এই কথা বলা হয়েছে। প্রকৃতি স্বভাব মানে কী? জন্মজাত গুণ। এই ব্যাপারেও আমরা সবাই জানি, বেশি কিছু বলার নেই। পরমপূজনীয় ডাক্তারজীর বিষয়ে আমরা শুনেছি, ক্রোধ তাঁর জন্মজাত প্রকৃতি ছিল, কিন্তু সঙ্ঘের জন্য সংগঠনের স্বার্থে ক্রোধ ছেড়ে দিলেন। ক্রোধ জয় করলেন। এই হচ্ছে প্রকৃতি স্বভাবের সমর্পণ। এটা আমার জন্মজাত স্বভাব— সুতরাং আমি যেমন আছি তেমনই থাকবো, বদলাবো না'— এরকম বলে লোকসংগ্রহের কাজে লেগে যাওয়া প্রকৃতি সমর্পণ কখনও নয়। প্রসঙ্গক্রমে পরমপূজনীয় শ্রীগুরুজীর একটি পত্রের কথা মনে পড়ে। ১৯৬৫ সালের পত্র। শ্রীগুরুজী সমগ্র দর্শনের ৮ম খণ্ডে আছে। কিন্তু ওই পত্রের পৃষ্ঠভূমিকা কি? আমাদের একজন সঙ্ঘচালক, তাঁর নাম মাননীয় লক্ষ্মণরাও যোশী। উনি উৎকল প্রদেশে কিছুদিন প্রচারক ছিলেন। তাঁর প্রচারক থাকাকালীন শ্রীগুরুজী একবার সেখানে যান। বৈঠকে নতুন পুরাতন স্বয়ংসেবকরা উপস্থিত ছিলেন। যথাযথ পদ্ধতিতে বৈঠক শুরু হওয়ার পর অত্যন্ত মধুরভাবে শ্রীগুরুজী ও স্বয়ংসেবকদের মধ্যে পরস্পরের পরিচয় হচ্ছে। ইতিমধ্যে হঠাৎ শ্রীগুরুজীর দৃষ্টি পেছনে পা ছড়িয়ে বসে থাকা এক স্বয়ংসেবকের উপর গিয়ে পড়ল। স্বয়ংসেবকটি একেবারে নতুন, যে কিনা এর আগে পূজনীয় গুরুজীকে কোনওদিন দেখেইনি। অলসভাবে বসা ওই স্বয়ংসেবকটিকে দেখামাত্র গুরুজীর খুব রাগ হল। তিনি বেশ কড়া সুরেই বললেন, 'বৈঠকে তোমরা এভাবেই বস নাকি? ওকে বৈঠক থেকে বের করে দাও।' সঙ্গে সঙ্গে তাকে বৈঠক থেকে বের করে দেওয়া হল। বৈঠক তো হয়ে শেষ হল। তার এক সপ্তাহ পরে শাখার মুখ্যশিক্ষক নাগপুরে পূজনীয় গুরুজীকে একটি পত্র পাঠিয়ে বৈঠকে ঘটে যাওয়া ঘটনার বিষয়ে জানাল, "সেদিনের ওই স্বয়ংসেবকটি একদম নতুন ছিল। আমিই তাকে সেদিন বৈঠকে এনেছিলাম। বৈঠকের পর সে মনে খুব দুঃখ পেয়েছে।" শেষে লিখল, অন্য কিছু নয়, শুধুমাত্র আপনার অবগতির জন্য এই পত্র লিখলাম।"

পূজনীয় শ্রীগুরুজী এর জবাবে উত্তর পাঠালেন, "আপনি আমার ব্যবহারে যে ত্রুটি দেখেছেন এবং তা সঙ্গে সঙ্গে ধরিয়েও দিয়েছেন, এরজন্য আমি বড় উপকৃত। এরপর এমন যাতে না হয় তার খেয়াল অবশ্যই রাখব। তবুও অসাবধানবশতঃ কিছু না কিছু ভুল হয়েই যায়। আমার হিতৈষী বন্ধুদের জন্য এর কুপ্রভাব থেকে বাঁচবার শিক্ষা আমি পেয়ে যাই আমার সহযোগী কার্যকর্তার দৃষ্টির ফলে। বোলাঙ্গির বৈঠকে আমি যে অনুচিত ব্যবহার করেছি তার জন্য সমস্ত স্বয়ংসেবকের কাছে বিশেষ করে ওই নতুন স্বয়ংসেবকের কাছে আমি আমার ব্যবহারের জন্য মার্জনা চাইছি..... ।"

এই পত্র থেকে আমরা কি বুঝতে পারি তা একবার ভেবে দেখা দরকার।

নিজের জন্মজাত স্বভাবের বিষয়ে গুরুজী নিজে বলেছেন, "আমি ক্রোধী পিতার ক্রোধী সন্তান।" আর এক জায়গায় বলেছেন, "আমি শীঘ্র ক্রোধী কিন্তু দীর্ঘদ্বেষী নই। ক্রোধ আসে যায়, কিন্তু তার প্রভাব মনের মধ্যে বেশি পড়তে দিই না।" এই বিষয়েই তিনি তাঁর শেষ পত্রে লিখেছেন। এজন্যই ধ্যেয়ের এই দীর্ঘ পথযাত্রাতে গুরুজী সম্ভবত অক্রোধী হয়তো ছিলেন না। কিন্তু জিতক্রোধী অবশ্যই ছিলেন। মহর্ষি নিজের বিষয়ে বলতেন,—

"ন্যস্তদণ্ডাঃবয়ং রাজন্। জিতক্রোধ জিতেন্দ্রিয়াঃ।"

"আমি অক্রোধী নই, কিন্তু ক্রোধ তো মাঝমধ্যে এসে যায়, আসবেই। তাতে আপত্তি কি? কিন্তু ক্রোধকে আমি জয় করতে পেরেছি। জিতক্রোধ হয়েছি।" সুতরাং শ্রীগুরুজী যে জিতক্রোধী ছিলেন, এই পত্র থেকেই তা বোঝা যায়। অর্থাৎ প্রকৃতি স্বভাবের ওপর আমরা কিভাবে সমর্পণের ভাব আনতে পারি তার উদাহরণ পূজনীয় ডাক্তারজী ও শ্রীগুরুজীর জীবনে দেখতে পাওয়া যায়।

**আত্মসমর্পণ**

এ অত্যন্ত কঠিন এক বিষয়। আত্মসমর্পণ মানে কি? আমাদের পূর্বপুরুষগণ বলে থাকেন আমাদের জন্ম প্রারব্ধ থেকে হয়ে থাকে। অর্থাৎ পূর্বকর্মের ফল ভোগ করার জন্য আমরা সকলে এই ভূমিতে আবার জন্মেছি। অর্থাৎ নিজের চরম উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমাদের নিজের জীবন চলছে। এটাই হচ্ছে নিজ আত্মার উদ্দেশ্য। শরীর, মন, বুদ্ধি এ উদ্দেশ্য সাধনের মাধ্যম মাত্র। অর্জুন গীতাতে শ্রীভগবানকে জিজ্ঞাসা করছেন— "যাঁর যোগসাধনা এই জন্মে সফল হল না, সেই ধরনের ভ্রষ্ট যোগীর দশা কিরূপ হয়?" ভগবান উত্তরে বললেন, "কোনও সৎ পরিবারে বা যোগীর বংশে ওই ব্যক্তির জন্ম হয় এবং ফেলে আসা অসম্পূর্ণ সাধনা সে পূর্ণ করে।" পূর্বজন্মের বাসনা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে এই জন্মে তা সার্থকতার রূপ দেয়। এই জন্যই পূজনীয় গুরুজীর জন্ম হয়েছে। এক বিশিষ্ট জীবন উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন। এইজন্যই প্রকৃতি স্বভাবাৎ তাঁর ঝোঁক ছিল আধ্যাত্মিকতায়।

শ্রীগুরুজী যখন হিসলপ কলেজে পড়তেন তখন নীলসিটি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষকের কাছে গিয়ে পঞ্চ দশিকা দর্শন গ্রন্থ পড়ানোর জন্য বিশেষ আগ্রহ করেন। তারপর কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার পর সেখানে একজন বড় eosophist দেশাই-এর সম্পর্কে তিনি আসেন। চেন্নাইয়ে যাওয়ার পরও একদিন খুঁজতে খুঁজতে তিনজন সন্ন্যাসী তাঁর কাছে এসে পৌঁছান। তারপর সেখান থেকে নাগপুরে ফিরে আসার পর পুরনো পরিচিত হিসলপ কলেজে আবার যোগাযোগ করেন এবং রামকৃষ্ণ মিশনেও যাতায়াত শুরু করেন। অধ্যাপক হয়ে যাওয়ার পরও তিনি এই সব সম্পর্ক চালাতেই থাকেন। তারপর নাগপুরেও তিনি রামকৃষ্ণ আশ্রমে সাধনার জন্য যাতায়াত শুরু করেন। সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি, ছেলেবেলা থেকেই তাঁর ঝোঁক আধ্যাত্মিকতার প্রতি ছিল। শ্রীগুরুজীর আধার আধ্যাত্মিক ছিল। এই জন্য 'আত্মানো মোক্ষার্থম্' (নিজের মুক্তির জন্য) মাতাপিতার একমাত্র সন্তান হওয়া সত্ত্বেও মা-বাবাকে ছেড়ে স্বামী অখণ্ডানন্দের কাছে চলে গেলেন। গুরুদেবের সেবা করে মকর সংক্রান্তির পুণ্য তিথিতে দীক্ষা নিয়ে জীবনে এক অলৌকিক অনুভূতির আস্বাদ পান। আধ্যাত্মিক প্রেরণা লাভ করে তিনি প্রগতির পথে ক্রমশঃ অগ্রসর হতেই থাকেন।

সারগাছিতে গুরুদেবের শেষ অবস্থায় তাঁর সেবা করার সৌভাগ্য শ্রীগুরুজী লাভ করেন। গুরুদেবকে সারগাছি থেকে বেলুড় মঠ পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার দায়িত্বও তাঁর ওপর আসে। পূজনীয় গুরুদেবের মহাসমাধির পর আবার নাগপুরে ফিরে এসে তিনি ডাক্তারজীর সান্নিধ্যে আসেন। ডাক্তারজীর অন্তর্বাহ্য দর্শনের সৌভাগ্য তাঁর হয় এবং বিশেষ অনুভূতি হয়। পূজনীয় ডাক্তারজীরও অসুস্থ দেহের অন্তিম সেবা করার সৌভাগ্যও শ্রীগুরুজী লাভ করেন। ডাক্তারজীর জীবনের শেষ মুহূর্তে তাঁর হৃদয়ে প্রজ্জ্বলিত আগুনকে শ্রীগুরুজী কাছ থেকে চিনতে পেরেছিলেন। তিনিই আমার ইষ্টদেব— এরূপ মেনে নিয়ে তাঁর শ্রীচরণে জীবনকে সমর্পিত করে দিলেন। যে উদ্দেশ্যের জন্য তিনি এই পৃথিবীতে এসেছিলেন তাকে তুড়ি মেরে ডাক্তারজীর দর্শানো পথের পথিক হয়ে গেলেন। ডাক্তারজীর দেখানো রাষ্ট্রকার্যই তাঁর ধ্যেয়পথ হয়ে যায়। কত বড় সমর্পণ! একেই বলে আত্মসমর্পণ।

**বদ্ধাকটীয়ম্**

এখনও পর্যন্ত কায়েন বাচা 'মনসেন্দ্রিয়ৈর্বা' এই শ্লোকের ভিত্তিতে সমর্পণের অন্যান্য দিক তুলে ধরা হয়েছে। এসবই 'পতত্বেষ কায়ো'র মধ্যেই পড়ে। কিন্তু এই সমস্ত ভগবানের শ্রীচরণে সমর্পণের

*(এরপর ১৫ পাতায়)*

# বিশ্বকাপ ফুটবল প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির সালতামামি

**জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়।।** শেষ হলো 'গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ'। একমাস ধরে চলা এই বিশ্বকাপ ফুটবল বিশ্ববাসীর কতটা মনোরঞ্জন করতে পারল তা নিয়ে চলবে চুলচেরা গবেষণা। ফুটবল রোম্যান্টিক থেকে তাত্ত্বিক, শিক্ষার্থী থেকে গবেষক কে কি পেল তা বোঝা যাবে পরবর্তী এক বছরে। তবে সমালোচকের দৃষ্টিকোণে পর্যালোচনা করতে বসলে প্রথমেই উঠে আসবে উদ্ভাবনী সৃজন বৈচিত্র্যের অভাব। বেরিয়ে আসবে রেফারিংয়ের ক্রমাবনতির গ্রাফ। আধুনিক প্রযুক্তির অভাবে অনেক ক্ষেত্রেই ভুল সিদ্ধান্তের শিকার হতে হয়েছে বিশেষ বিশেষ টিমকে। স্মরণকালের মধ্যে কোনও বিশ্বকাপে এত নিম্নমানের রেফারিং হয়নি। ম্যাচগুলোতে রেফারিং ঠিক হয়নি। এবার অন্তত চারটি ম্যাচে রেফারির ভুল সিদ্ধান্তে চরম খেসারত দিতে হয়েছে তিনটি দলকে। মেক্সিকো, আর্জেন্টিনা ও ইংল্যাণ্ডের বিদায় সূচিত করেছে এইসব অপরিণামদর্শী সিদ্ধান্ত। এই ব্যাপারে এখন থেকেই ফিফার নজর দেওয়া উচিত। দুনিয়ার সব খেলার আন্তর্জাতিক মানের প্রতিযোগিতায় ভিডিও টেকনোলজি ব্যবহার করা হচ্ছে। ফিফা কেন তার সদব্যবহার করবে না? দুর্বল রেফারিংয়ের পর অবশ্য ফিফা প্রেসিডেন্ট সেপ ব্লাটার ক্ষমা চেয়ে নিয়েছেন দুর্ভাগা দলগুলির টিম ম্যানেজমেন্টের কাছে। আর পরবর্তী বিশ্বকাপে প্রযুক্তির আধুনিকতম সুযোগ সুবিধে কাজে লাগাবেন বলেও অঙ্গীকার করেছেন।

খেলার মান অবশ্য সবসময় উঁচুভাবে বেঁধে রাখা যায়নি এই বিশ্বকাপে। যতদিন যাচ্ছে অধিকাংশ দল অ্যাথলিট ফুটবলার

**খেলার জগৎ**

নিয়ে আসবে। লং বল পাশিং আর রানিং নির্ভর ফুটবল মাঝেমধ্যে বিরক্তির উদ্রেক করেছে। কোথায় গেল ব্যক্তিগত উৎকর্ষতার দৃষ্টিনন্দন শৈলী, যা দেখতে কয়েক মাইল হেঁটে চলে আসা যায় মাঠে। ব্যক্তিগত স্কিল ও টেকনিকের সঙ্গে দলবদ্ধ আক্রমণাত্মক ছন্দ— যাকে বলা হয় 'অক্টেভিয়ান অর্কেস্ট্রেশন ব্রান্ড অব সকার'। যা খেলে এসেছে দশকের পর দশক ব্রাজিল, ইতালি বা সাম্প্রতিককালে ফ্রান্স, আর্জেন্টিনা। সেই ব্রান্ড ইকুইটি' এবার কোনও দলের খেলায় ছিল না। খানিকটা ঝলক দেখা গেছে স্পেনের খেলায় তাও বিক্ষিপ্ত লগ্নে।

টোটাল বা প্রেসিং ফুটবলই বা খেললো কোথায় বড় মানের দলগুলি। জার্মানির খেলায় যতটা ছিল গতি ও শৃঙ্খলা তার তুলনায় কোনও ম্যাচে সমষ্টিগত আক্রমণ তেমন কিন্তু মাঠ জুড়ে আক্রমণের ঢেউ তুলে আনতে পারেনি। এধরনের ফুটবল খেলে অবশ্য নেদারল্যান্ড। কিন্তু ক্রুয়েফ, লিসক্কে বা পরবর্তী গুলিট, বাস্তেনদের সময় যে টোটাল-প্রেসিং ফুটবল খেলে চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছিল ডাচরা এবার ফাইনালে উঠলেও সেই নিখুঁত ও বহুমাত্রিক প্যাটার্ন উইভিং খেলাটি মেলে ধরতে পারেনি। যদিও রবেন, স্নাইডার, ফান ফার্সি, ব্রঙ্কহস্ট সাধ্যমত লড়েছেন। তাদের লড়াই ডাচ ব্রিগেডকে ফাইনালে নিয়ে যায়। কিন্তু ফাইনালে রুবেন বিক্ষিপ্ত ভাবে জ্বলে উঠলেও ম্লান ছিলেন স্নাইডার, ফানপার্সি।

চাম্পিয়ন স্পেন অবশ্য বাকি দলগুলির তুলনায় আক্রমণে বৈচিত্র্য ফুটিয়ে তুলতে পেরেছে। গুণগত দক্ষতায় ভিয়া, টোরেস জাভি, ইনিয়েস্তা, র‍্যামোস, পুওল, পিকে ও অধিনায়ক তথা গোলকিপার ক্যাসিয়াস অন্যান্য দলের তাদের পজিশনের খেলোয়াড়দের তুলনায় একটু হলেও এগিয়ে আছেন। এই সুযোগটাই কাজে লেগে গেছে। প্রতিটি ম্যাচ স্পেন তাই কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে পড়েও বের করে নিয়েছে। তবে এই স্পেনকে কখনোই ১৯৮৬-র মারাদোনার আর্জেন্টিনা, ১৯৯৪ ও ২০০২-এর ব্রাজিল বা ১৯৯৮-এর ফ্রান্সের পাশে রাখা যাবে না। এই তথ্যেই পরিষ্কার বিশ্ব ফুটবলের মানদণ্ডে সাম্প্রতিককালের চাম্পিয়ন দলগুলির সাপেক্ষে স্পেনের শক্তি ও কৌলিন্যের পরিমাণ। আর তার সঙ্গে বড় বেশি প্রকট হয়ে উঠেছে সেকাল ও একালের বিশ্বফুটবলের তুলনামূলক অবস্থানের সমীকরণটি।

# মোহনবাগানীদের অবদান

*(৯ পাতার পর)*

চূড়ান্তভাবে নাকাল হয়ে হার স্বীকার করে শক্তিশালী যুগোশ্লাভাকিয়ার হাতে। মোহনবাগান গৌরব শৈলেন মান্নার নেতৃত্বাধীন ভারত সারা খেলায় শুধু বল ও স্লাভ খেলোয়াড়দের তাড়া করে বেড়িয়েছিল। শেষপর্যন্ত ১১-১ গোলে হার স্বীকার করে লন্ডন অলিম্পিকের অর্জিত সুনামকে ধূলিসাৎ করে ছাড়ে। ওই অলিম্পিকেও মান্না ছাড়া আরও কয়েকজন মোহনবাগানী ছিলেন। অলিম্পিকের আগে ভারত প্রীতি ম্যাচ খেলতে যায় হল্যান্ড, রাশিয়ায়। প্রীতি ম্যাচগুলিতে অবশ্য বেশ ভালই খেলেছিল ভারত। কিন্তু অলিম্পিকে এসে চূড়ান্ত ভরাডুবি হয়, যার জন্য অবশ্য মাঠও খানিকটা দায়ী।

পরের মেলবোর্ন অলিম্পিক অবশ্য ভারতকে বিশ্ব ফুটবলে প্রতিষ্ঠা পাইয়ে দেয়। বৃহৎ বিশ্ব পরিসরে ভারতের সর্বোত্তম কীর্তি ওই মেলবোর্ন অলিম্পিকে চতুর্থ স্থান প্রাপ্তি। মোহনবাগানের ঘরের ছেলে সমর (বদ্রু) ব্যানার্জির নেতৃত্বে ভারত সেবার বুট পরে মাঠে নেমেছিল প্রতিটি ম্যাচে। দলে মোহনবাগানের খেলোয়াড় ছিলেন একাধিক। যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম জার্নেল সিং, আমেদ হোসেন, কেষ্ট পাল, কানাইয়ান। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে গ্রুপ ম্যাচে ভারত জেতে ৪-১ গোলে। হ্যাটট্রিক করেছিলেন মুম্বাইয়ের নেভিল ডিসুজা। শক্তিশালী বুলগেরিয়ার সঙ্গে হাফ টাইম পর্যন্ত ভারত এগিয়েছিল এক গোলে। শেষপর্যন্ত অবশ্য হারতে হয়েছিল। ব্রোঞ্জ পদকের লড়াইয়ে আবার মুখোমুখি ভারত ও যুগোশ্লাভিয়া। অলিম্পিক ফুটবলে তখন এই দেশটি এক বড় শক্তি। আগের অলিম্পিকে তাদের হাতে বিধবস্ত হবার দুঃখ স্মৃতি ভুলে তুল্যমূল্য লড়াই করে ভারত যদিও ম্যাচটি ধরে রাখতে পারেনি। চতুর্থস্থান নিয়ে দেশে ফিরতে হয়। ১৯৬০-এর রোম অলিম্পিকে অবশ্য কোনও মোহনবাগানীকে অধিনায়ক করা হয়নি। রেলের প্রদীপ (পিকে) ব্যানার্জির হাতে দায়িত্ব দিয়ে ভারতকে পাঠানো হয় প্রাচীন সভ্যতার পীঠস্থান রোমে। কোচ ছিলেন চিরবরেণ্য রহিম সাহেব। যার কোচিংয়ে ভারত আন্তর্জাতিক ফুটবলে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হয় এবং টানা একদশক সেই মর্যাদার আসনটি ধরে রাখতে পেরেছিল। মেলবোর্ন অলিম্পিক থেকে যে আত্মপ্রত্যয় ও গরিমা লাভ করেছিল ভারত, তা অনেকটাই ধরে রাখতে পেরেছিল রোমের মাঠে। হাঙ্গেরি ও ফ্রান্সের মতো শ্রেষ্ঠদলের বিরুদ্ধে উজ্জীবিত ক্রীড়াশৈলী মেলে ধরে পিকের দল মাথা উঁচু করে দেশে ফিরে আসে। ফ্রান্সের সঙ্গে ড্র, হাঙ্গেরি ও পেরুর কাছে নামমাত্র গোলে পরাজয় স্বীকার করে ভারত। রোম অলিম্পিকেই শেষ হয়ে যায় ভারতের অলিম্পিক অভিযান। পরের টোকিও অলিম্পিকে মূলপর্বে খেলার যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি ভারত। প্রি- অলিম্পিকে দুবার ইরানের কাছে হেরে অলিম্পিকের টিকিট জোগাড় করতে পারেনি ভারত। মোহনবাগানী চুনী গোস্বামীর নেতৃত্বে ভারত সে বছরই এশিয়ান কাপের ফাইনালে উঠে ইজরায়েলের বিরুদ্ধে হেরে যায়। ইজরায়েল ও ইরানের বিরুদ্ধে দু'দুটি টুর্নামেন্টে হারের ফলে একদশক ব্যাপি এশিয়া ফুটবলে আধিপত্যকারী ভারতীয় ফুটবল দলের অলিম্পিকের অভিযানের অবসান হয়। তারপর ব্যর্থতার নিরবিচ্ছিন্ন অধ্যায়। যা মোহনবাগান ক্লাবকেও ভাবায়, বেদনাবিধুর করে সদস্যদের।

# শ্রোতাই ভগবান

*(১২ পাতার পর)*

শুনে এতটাই খুশি হয়েছিলেন যে কঠিন মানুষের চোখেও জল এসেছিল। এটা আমার স্মরণীয় ঘটনা। তিন বছর পরপর ফার্স্টক্লাস ফার্স্ট হয়েছিলাম। তিন বারের পর আর সুযোগ ছিল না।

নির্মলা মিশ্রের বিবাহ হয় সঙ্গীতশিল্পী প্রদীপ দাশগুপ্তর সঙ্গে। উনি একসময়ে রেডিও টিভিতে গান করতেন। রেকর্ডও আছে। দু'জনে একসঙ্গে উড়িষ্যায় তখনকার কোনও প্রোগ্রামে প্লেব্যাক করেছেন। দীর্ঘদিন প্রদীপ দাশগুপ্ত সঙ্গীত জগৎ থেকে সরে এলেও নির্মলাদির প্রেরণা ও উৎসাহদাতা হিসেবে আজও আছেন।

বর্তমান প্রজন্মের জন্য এখন অনেক সুযোগ এসেছে। রিয়েলিটি শো আরও কত কি! এ প্রসঙ্গে আপনার অভিমত কি?

দেখ, সকলকে আমি ভালবাসি। আর কিছু বলার নেই। তবে রিয়েলিটি শো নিয়ে আমার আপত্তি। ফার্স্ট সেকেণ্ড করে বাকিদের মানসিক কষ্ট দেওয়া। সকলেই কিন্তু ট্যালেন্টেড। এদের একটা গন্ডির মধ্যে বেঁধে দেওয়া। গানবাজনার লাইনটা এখন ঠিক নয়। পরে কে যে কোনও দিকে যাবে, নিজেরাই ঠিক বুঝতে পারে না। তবে এদের কিছু বলব না। কারণ এরা সব কিছু জেনে গেছে। তাই, ওদের আমার মতো মানুষের বলার কিছু নেই। যদি ব্যক্তিগতভাবে কেউ আমার কাছে পরামর্শ চায়, নিশ্চয়ই বলব।

'বাবার মেয়ে জেদি মেয়ে'— তাই নির্মলা মিশ্র স্বতন্ত্র। কণ্ঠলাবণ্য তাঁকে অনেক জনপ্রিয় করেছে। দেশবিদেশে আমন্ত্রণে গেছেন শুধু তাদের ভালবাসার টানে। জীবনে পেয়েছেন প্রচুর পুরস্কার। কিন্তু তাঁর কথায়ঃ ভালবাসা পুরস্কার সবচেয়ে বড় পুরস্কার। যাদের জন্য আজ এখানে দাঁড়িয়েছি তারাই আমার ভগবান।

## শব্দরূপ - ৫৫৬

**মধুচ্ছন্দা বারিক**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | | ২ | ■ | ৩ | | | |
| | ■ | ৪ | | | ■ | ■ | ■ |
| ■ | ৫ | | ■ | ৬ | | ৭ | |
| ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ |
| ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ |
| ৮ | | | ৯ | ■ | ১০ | | ■ |
| ■ | ■ | ■ | ১১ | | | ■ | ১২ |
| ১৩ | | | | ■ | ১৪ | | |

**সূত্র ঃ**

**পাশাপাশি ঃ** ১. কমল লোচন প্রতিশব্দে, ৩. শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়ার চাঁদ, একে-দুয়ে বালক, ৪. নৌকোর তক্তা জোড়া দিবার চেপ্টা দুমুখো লোহার পেরেক বিশেষ, প্রথম দুয়ে পত্র, ৫.ফুল, ফল বা পাতার বোঁটা, ৬. হরিচন্দন, প্রথম তিনে পুত্র, ৮. মনোজ, কন্দর্প, এক-দুয়ে হৃদয়, শেষ দুয়ে মনসা বৃক্ষ, ১০. পুরাণবর্ণিত চতুর্থ যুগ, ১১. চাঁদ সদাগরের পুত্র, ১৩. রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ, ১৪. লাল আভা, আগাগোড়া তিববতীয় বৌদ্ধ পুরোহিত।

**উপর-নীচ ঃ ১**. রামায়ণে বর্ণিত ঋষ্যমূক পর্বতের নিকটস্থ নদী, ২. ঊষাকাল, মধ্যে ঠ্যাং, ৩. বিপ্র, দ্বিজ, ৫. শ্রীকৃষ্ণের বিহার কানন, প্রথম দুয়ে রাধিকার সখীবিশেষ, ৭. প্রাচীন যজ্ঞে মানুষ কেটে দেবতাকে উপহার দেওয়া, ৯. প্রতিশব্দে মেঘ, বারিদ, ১০. এক-দুয়ে কবরী, শেষ দুয়ে বুধপত্নী আসলে নবজাত বকনা বা স্ত্রীবাছুর, ১২. হিমালয় ও মেনকার কন্যা।

**সমাধান শব্দরূপ ৫৫৪**

**সঠিক উত্তরদাতা**

**শৌনক রায়চৌধুরী**
**কলকাতা-৯।**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ | ত্রি | শূ | ল | ■ | সা | ত্য | কি |
| ■ | ক | ■ | ক্ষী | ■ | ধু | ■ | চি |
| সু | ■ | ■ | প | ই | তা | ■ | র |
| দ | ণ্ড | নী | তি | ■ | ■ | ■ | মি |
| র্শ | ■ | ■ | ■ | ক | ল | ম | চি |
| ন | ■ | অ | স | ম | ■ | ■ | র |
| চ | ■ | ত | ■ | লা | ■ | ম | ■ |
| ক্র | ন্দ | সী | ■ | ক্ষ | ত্রি | য় | ■ |

● ৫৫৬ সংখ্যার সমাধান আগামী ১৬ আগস্ট, ২০১০ সংখ্যায়।

# মিঞা সাহেবদের জয়ধ্বনি

**শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়**

নাহ্, মিঞা সাহেবদের বিরুদ্ধে কোনও কিছু লেখা বা বলা চলবে না। কারণ সে লেখা কোনও দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হবে না। সাপ্তাহিক, পাক্ষিক বা মাসিক পত্রিকাগুলিও সেগুলি স্পর্শ করবে না। এদের অনেকেই মাসোহারা বা ভাতা পেয়ে থাকে বলে অভিযোগ। উপরন্তু প্রশাসনিক ক্ষমতার অলিন্দে থাকা কিছু রাজনীতির ব্যাপারী কুপিত হতে পারেন। কারণ তারা দায়িত্ব নিয়েছেন ইস্‌লামের সম্প্রসারণ আর রক্ষণাবেক্ষণের। মিঞা সাহেবদের পূর্ব-পুরুষরা একদিন তরবারির দ্বারা এদেশ অধিকার করে সাতশো বছর রাজত্ব করেছিলেন। বর্তমানে এরা এদেশে সংখ্যালঘুতে পরিণত হলেও এদের ধমনীতে প্রবাহিত হচ্ছে সুলতান মামুদ, মহম্মদ ঘোরী, তৈমুর লঙ্ বাবর প্রভৃতির রাজকীয় ধারা। এটা অস্বীকার করা যায় না তারা রাজার জাত। তাই তো দেশের প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশের সম্পদের ওপর সংখ্যালঘুদের প্রথম অধিকার। যথার্থই বলেছেন প্রধানমন্ত্রী। রাজা রাজ্যচ্যুত হলেও তাঁর রাজকীয় আচার আচরণ পরিত্যাগ করতে পারেন না। অথচ তাঁর রাজকীয় অভ্যাস আচরণ বজায় রাখার জন্য তাঁকে যথেষ্ট মূল্য দিতে হয়। কথিত আছে পলাশীর যুদ্ধে পরাজয়ের পর পলায়নরত নবাব সিরাজদ্দৌল্লা ধরা পড়েছিলেন তাঁর মহামূল্যবান পাদুকার জন্য। তাই সরকারের উচিৎ এসব বিষয়ে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে ক্ষমতাচ্যুত রাজাদের সেবায় নিজেদের উৎসর্গ করা এবং সেটা তারা করছেনও।

এদেশে সংখ্যালঘুরা অবহেলিত, অনগ্রসর, শিক্ষার আলোক বর্জিত, দরিদ্র, নির্যাতিত আরও অনেক কিছু। তাই সরকার সাচার কমিটি, রঙ্গনাথন মিশ্র কমিশন প্রভৃতি গঠন করে তাদের সুপারিশ অনুযায়ী সংখ্যালঘুদের উন্নয়নে ব্রতী হয়েছেন। সুপারিশগুলির প্রধান হলো 'সংরক্ষণ'। সংখ্যালঘুদের জন্য অবশ্যই সংরক্ষণ চাই। চাকরীতে, উচ্চশিক্ষায়, ব্যাঙ্ক ঋণ প্রভৃতি বিষয়ে সংখ্যালঘুদের জন্য সংরক্ষণ। এরপর হয়ত বিধায়ক সাংসদ এমন কী মন্ত্রীপদেও সংরক্ষণের দাবী উঠবে। অর্থাৎ মোট বিধায়ক, সাংসদ বা মন্ত্রীদেরও ১০ শতাংশ সংখ্যালঘুদের জন্য সংরক্ষিত রাখা হবে। সংখ্যালঘুদের সব বাধ্যতামূলক কর (ট্যাক্স) যেমন আয় কর, বিক্রয় কর প্রভৃতি থেকে রেহাই দিতে হবে ধনী, দরিদ্র নির্বিশেষে। ট্রেনভাড়া দেওয়া থেকে রেহাই দিলে খুবই ভালো হয়। প্রয়োজনে সংখ্যাগরিষ্ঠদের ট্রেনভাড়া বৃদ্ধি করা যেতে পারে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অনেকেই ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়ে থাকেন। সেই ঋণ শোধ করার জন্য তাদের যেমন অযথা উত্যক্ত করা না হয়, প্রয়োজনে ঋণ মকুব করে দেওয়া যেতে পারে। সাচার কমিটি রঙ্গনাথন মিশ্র কমিশন প্রভৃতির মতো একটি কমিটি গঠন করা যেতে পারে। তারা সুপারিশ করবে আরও কি কি ভাবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের খিদ্‌মত্ করা যেতে পারে। রাজপুত্ররা একটু চপলমতি হয়ে থাকে। সে কারণে তারা মাঝে মধ্যে কিছু দুষ্কর্ম করে। যেমন সিরাজদ্দৌল্লা গঙ্গাবক্ষে যাত্রীবোঝাই বজরা বা নৌকা ডুবিয়ে দিয়ে মজা দেখতেন। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের তরুণেরা মাঝে মাঝে কিছু দুষ্কর্ম করে থাকে। যেমন চলন্ত ট্রেনের মহিলা কামরা থেকে কিশোরী অপহরণ, স্কুলে যাওয়ার গাড়ী থেকে স্কুলছাত্রী অপহরণের প্রচেষ্টা, বাধাপ্রাপ্ত হলে গাড়ীর চালককে হত্যা। ফাঁকা বাড়ীতে একা পেয়ে কিশোরীকে ধর্ষণ করা। এ ছাড়া বানতলা, ধানতলা, খোক্‌সডাঙ্গা, গোয়ালতোড় প্রভৃতি স্থানের ঘটনা তো রয়েছে। এ সব ক্ষেত্রে কোনও অভিযোগ গ্রাহ্য করা উচিৎ হবে না। তবে হিন্দুরা ওই সমস্ত কর্মে লিপ্ত হলে যেন দৃষ্টান্তমূলক সাজাপ্রাপ্ত হয়, সেদিকে বিশেষ নজর দিতে হবে। নাশকতামূলক কাজকর্মে জড়িত কোনও জঙ্গি ধরা পড়লে সে যদি সংখ্যালঘু, সম্প্রদায়ের হয় তাহলে তার অপরাধ যেন লঘুভাবে দেখা হয়। মুম্বাইতে ১২ মার্চ, '৯৩ যে বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছিল, ১১ জুলাই ২০০৬ তে ওই মুম্বইতে ৭টি ট্রেনে এবং ২৬ নভেম্বর ২০০৮-এ সেই মুম্বইতেই তাজ হোটেল, ভিক্টোরিয়া টার্মিনাসসহ বিভিন্ন এলাকায় সে সন্ত্রাস সৃষ্টি হয়েছিল সেইসব দুষ্কর্মের নায়কদের সঙ্গে জ্ঞানেশ্বরী এক্সপ্রেসের নাশকতামূলক কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত দুষ্কৃতীদের এক করে দেখাটা ঠিক হবে না। জ্ঞানেশ্বরী এক্সপ্রেসের দুষ্কর্মের নায়কদের চরম দণ্ড দিতে হবে। মুম্বইসহ ভারতের বিভিন্ন স্থানে নাশকতামূলক কাজকর্মের সঙ্গে জড়িত দুষ্কৃতীদের একটু ভেবেচিন্তে ব্যবস্থা নিতে হবে। কারণ এগুলির সঙ্গে আন্তর্জাতিক একটা সম্পর্ক রয়েছে। বাংলাদেশ, পাকিস্তান, সৌদিআরব, সুদান প্রভৃতি রাষ্ট্রের একটা সুসম্পর্ক বজায় রয়েছে ওই সব সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে।

তবে মন্দের ভালো, প্রশাসনিক স্তরে অনেক বান্দা রয়েছে এসব দেখভাল করার জন্য। সংবাদে প্রকাশ মিঞা সাহেবদের আশুায় তা দেওয়ার জন্য নাকি নতুন মুর্গি পাওয়া গেছে। তাই জোরকদমে 'আশুায়' তা দেওয়ার কাজ চলছে। কলকাতা বড়বাজারে সম্পূর্ণ হিন্দু অধ্যুষিত এলাকায় হিন্দু ব্যবসায়ীদের সহযোগিতায় একটি মসজিদ নির্মিত হয়েছিল বছর ২০ আগে। সম্প্রতি সেই মসজিদটির সম্প্রসারণে মুসলমানরা স্থানীয় হিন্দুদের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়। হিন্দুদের বক্তব্য মসজিদটির সম্প্রসারণ ঘটলে পরিবেশ দূষণ ঘটবে, তারা আলো বাতাসহীন হয়ে পড়বে। স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি অশোক ঝা'র নেতৃত্বে প্রতিরোধ হতে থাকে। বিষয়টি সৈয়দ মহম্মদ নুর বরকতি রহমানের মাধ্যমে মমতা ব্যানার্জী জানতে পারেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি অশোক ঝা'কে বরখাস্ত করেন এবং স্থানীয় বিধায়ক দীনেশ বাজাজকে দায়িত্ব দেন মসজিদটির সম্প্রসারণে। সম্প্রতি তৃণমূল নেত্রী ঘোষণা করেছেন বালিগঞ্জে রেল স্টেশনের নাম স্বাধীনতা সংগ্রামী বাহাদুর শাহ্ জাফর-এর নামে হবে। বালিগঞ্জ রেল স্টেশন থেকে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে রয়েছে প্রণবানন্দ মহারাজ প্রতিষ্ঠিত ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন যাদুকর পিসি সরকারের বাড়ী। এঁদের কারও ঠাঁই হল না। বাহাদুর শাহ্ কবে কোথায় স্বাধীনতা সংগ্রাম করেছেন কেউ প্রশ্ন করে না। ১৮৫৭-য় সিপাহী বিদ্রোহের সময় মুসলমান সিপাহীরা চেয়েছিল ভারতে ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটিয়ে মুসলিম শাসনের প্রবর্তন ঘটাতে। তাই তারা শেষ মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ্ জাফরকে তখত্-এ আসীন করেছিল। বাহাদুর শাহ্-এর অবদান এইটুকুই। এ ছাড়া চাঁদনী চক মেট্রো স্টেশনের নাম টিপু সুলতান করা হচ্ছে। কে এই টিপু সুলতান? প্রায় ৮০০ হিন্দু মন্দির ধ্বংসকারী টিপু সুলতানের প্রধান কাজ ছিল সহস্র সহস্র হিন্দুকে ইসলামে ধর্মান্তরিত করা অথবা হত্যা করা। তার আরও একটা কাজ ছিল হিন্দু রমণীদের বন্দী করে নিজের সৈন্যদের মধ্যে বন্টন করা। এমন একজন মহৎপ্রাণ সুলতানের নামে চাঁদনী চক মেট্রো স্টেশনটি উৎসর্গ করা হলো। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে আশুায় তা দেওয়া চলছে জোর কদমে। এবার শুরু হয়েছে সল্টলেক সিটির বিভিন্ন রাস্তার নামকরণ। রিজওয়ানুর রহমানের নামেও কোনও রাস্তার নামকরণ হবে আশা করা যেতেই পারে। কলকাতা শহরেরও কোনও নতুন নাম হতে পারে। এছাড়া ফোর্ট উইলিয়াম, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, শহিদ মিনারসহ আরও কত কিছু আছে। কলকাতাকে লণ্ডন বানাতে এগুলি খুবই কার্যকরী হবে।

সুখের বিষয় 'মুসলিম আশুায়' তা দেওয়ার সুফল বা পরিণতি কি হতে পারে আমাদের তা দেখতে হবে না। দেখবে আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম। স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি মনীষীদের নাম মুছে যাবে; মেসোপটেমিয়া, পারসিক বা মিশরীয় সভ্যতার মতো হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিলুপ্তি ঘটবে; বুদ্ধদেব, মহাবীর, শঙ্করাচার্য, রামানুজম, শ্রীচৈতন্য, ঠাকুর রামকৃষ্ণ প্রভৃতি মহাপুরুষদের নাম পৃথিবী থেকে মুছে যাবে। সারা দেশে রণিত হবে, ধ্বনিত হবে ''লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ মহম্মদুর রসুলুল্লাহ্''

**চাঁদনীচক মেট্রো স্টেশনের নাম টিপু সুলতান করা হচ্ছে। কে এই টিপু সুলতান? প্রায় ৮০০ হিন্দু মন্দির ধ্বংসকারী টিপু সুলতানের প্রধান কাজ ছিল সহস্র সহস্র হিন্দুকে ইসলামে ধর্মান্তরিত করা অথবা হত্যা করা। তার আরও একটা কাজ ছিল হিন্দুরমণীদের বন্দী করে নিজের সৈন্যদের মধ্যে বন্টন করা। এমন একজন মহৎপ্রাণ সুলতানের নামে চাঁদনী চক মেট্রো স্টেশনটি উৎসর্গ করা হলো।**

# সমর্পণ

(১৩ পাতার পর)

সমর্পণের অন্যান্য দিক তুলে ধরা হয়েছে। এসবই 'পতত্বেষ কায়ো'র মধ্যেই পড়ে। কিন্তু এই সমস্ত ভগবানের শ্রীচরণে সমর্পণের পরেও শুধুমাত্র শরণাগতি নিয়ে নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকা নয়। তা তো একপ্রকার অদৃষ্টবাদ হয়ে গেল। সবকিছু ভগবান দেখবেন— এমন নয়। সম্পূর্ণ সমর্পণের পর আমরা বদ্ধা কটিয়ম্‌ও বলেছি। সম্পূর্ণ সমর্পণ করে আমরা কিছুই করব না, এটা ঠিক নয়। কেরলে খৃস্টানদের একটি উপপন্থ আছে। রোমান ক্যাথলিক, প্রোটেস্টান্ট, প্রেসবিটোরিয়ানের মতো সিলোন পন্থেকোস্ট এবং ইণ্ডিয়ান পন্থেকোস্ট এরূপ দুই ধরনের চার্চ আছে। এই পন্থেকোস্টদের ঈশামসিহার ওপর এতই সমর্পণ ভাব যে, এরা কোনওদিন ডাক্তার বৈদ্যের কাছে যায় না। যদি কেউ অসুস্থ হয়ে যায় তো এরা ভজন কীর্তনের একটা দলকে নিয়ে ওই অসুস্থ রোগীর বিছানার কাছে যায় আর জোরে চীৎকার করে ঈশামসিহার কীর্তন করে। যদি ওই রোগী মারাও যায় তাহলে বলে ঈশামসিহা তাকে উদ্ধার করেছে। কিন্তু ডাক্তারের কাছে কিছুতেই যাবে না। এই হচ্ছে পন্থেকোস্টদের সমর্পণ। ভগবান ঈশা বলো আর ঈশা মসিহা বলো, তাঁদের নিজেদের সমর্পণ কিন্তু এমন ছিল না।

ঈশামসিহার জীবন অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ উচ্চমানের ছিল। বড় সন্ত ছিলেন তিনি, একটি বিভূতিসম। ভগবানের ভরসাতে তিনি বাঁচতেন। একবার শয়তানের মনে তাঁর পরীক্ষা নেওয়ার ইচ্ছা হল। ভাবল, এর মন সম্পূর্ণ ভগবানে ভরসা আছে কি? একদিন শয়তান এসে বলল, ''চলো ওই উঁচু জায়গাটার একেবারে মাথায় আমরা যাই। বলার সঙ্গে সঙ্গে তারা সেখানে চলেও গেল। শয়তান বলল, 'এখন দেখো, নীচে বড় বড় খাদ দেখতে পাচ্ছ না? তুমি ভগবানে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করো না? যীশু— হ্যাঁ আমি বিশ্বাস করি।

শয়তান— ভগবানকে তুমি পিতা মনে কর কিনা? ভগবান তোমাকে রক্ষা করবেন কিনা?

যীশু— নিশ্চয়ই করবে।

শয়তান — এখন আমি বলছি, তুমি জোর একটা লাফ মারো ওই নীচের গর্তে। দেখা যাক, তোমার ভগবান তোমাকে রক্ষা করেন কিনা?

তখন ঈশামসিহা অত্যন্ত সুন্দর জবাব দিলেন। ঈশামসিহা বললেন, ''আমি যদি পড়ে যাই তো ভগবান অবশ্যই আমাকে বাঁচাবেন। কিন্তু নিজের থেকে যদি জোর করে লাফ মারি তাহলে ভগবান আমাকে কখনও বাঁচাবেন না।'' আমি পড়ে গেলে ভগবান অবশ্যই উদ্ধার করবেন। এই ধরনের ভাবই আসলে সমর্পণ। এই ধরনের সমর্পণেই পৌরুষ আছে, চরিতার্থতা আছে, কর্তৃত্ব আছে। এ ধরনের সমর্পণে কোনও আপত্তি নেই।

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কথা ধরা যাক। তিনি তাঁর সম্পূর্ণ জীবন মা কালীকে সমর্পণ করেছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি দিনরাত তপস্যায় ডুবে থাকতেন, দিব্য অনুভূতি পেতেন। পরবর্তীকালে তোতাপুরীকে গুরু হিসাবে মেনে নেওয়ার আগে পর্যন্ত কখনও মা কালীর আজ্ঞা বিনা এক পা-ও তিনি এগোতেন না। এই হচ্ছে পুরুষার্থের সঙ্গে শরণাগতি— একেই বলে প্রকৃত সমর্পণ।

সমর্পণের এই ভাবকে ঠিকমতো বুঝে নিজের জীবনে যেখানে যেখানে কিছু ঘাটতি বা অভাব আছে বলে অনুভব হচ্ছে, তা পূরণ করার এবং ঠিক করার চেষ্টা আমরা করব।

**('সমর্পণ' সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় প্রাক্তন বৌদ্ধিক প্রমুখ শ্রী রঙ্গাহরিজীর একটি হিন্দি ভাষণের বঙ্গানুবাদ। অনুবাদক ঃ রোহিণী প্রসাদ প্রামাণিক।)**

Swastika
26 July - 2010, Rs. 4.00 only
RNI No.5257/57
Registration No. Kol. RMS / 048/2010 -2012
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. MM&P.O. / SSRM-Kol. RMS/ RNP-048/LPWP-028/2010 -12

# কেরলে পপুলার ফ্রন্টের অফিসে তল্লাসি
# উদ্ধার প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র ও বোমা

**নিজস্ব প্রতিনিধি।।** গত ১৩ জুলাই পুলিশ একসঙ্গে সারা কেরল জুড়ে উগ্র ইসলামি সংগঠন 'পপুলার ফ্রন্ট অফ্ ইন্ডিয়া'-র (পি এফ আই) বিভিন্ন কার্যালয়ে তল্লাশি অভিযান চালায়। বিভিন্ন জেলায় ওই সংগঠনের কমপক্ষে ১০০টি অফিসে একসঙ্গে অভিযান চলে। কেরল রাজ্য সদর দপ্তরেও অভিযান চলে। উদ্ধার হয় বোমা, তরোয়াল এবং অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র, প্রচার সি ডি, পোস্টার এবং প্রচারপত্র প্রভৃতি। এদিকে এর্নাকুলাম পুলিশ কর্তৃপক্ষ পপুলার ফ্রন্টকে তাদের ক্যাডারদের 'স্বাধীনতার প্যারেড'-এর অনুশীলন বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছিল। যা মানা হয়নি। কেরল হাইকোর্টের ওই আদেশ 'পপুলার ফ্রন্ট অফ্ ইন্ডিয়া'-কে নিষিদ্ধ করার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতেই ছিল। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে এই নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে তাদের প্রতিক্রিয়া জানাতে বলা হয়েছে।

মুসলিম লীগের জন্মের পর থেকে এবং বিশেষ করে ১৯৪৭ সালের পরে ৬৩ বছর ধরে মুসলীম লীগকে সার-জল দিয়ে ডালপালা বিস্তারের সুযোগ করে দিয়েছে এদেশের কমুনিস্ট ও কংগ্রেসীসহ সেকুলারবাদীরা। তার ফল ভোগ করতে হচ্ছে অমুসলমানদেরকে। এর্নাকুলাম জেলায় চার্চ থেকে বাড়ি ফেরার পথে খৃস্টান অধ্যাপকের হাত কেটে নিয়ে চলে যাবার পর কিছুটা সক্রিয় হয়েছে প্রশাসন ও পুলিশ।

ওইদিন পি এফ আই-এর অফিস ছাড়াও নেতাদের বাড়িতেও পুলিশী অভিযান চলে। কন্নুর জেলাতেই কুড়িটি স্থানে তল্লাসী চলে। তাজা বোমা এবং অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র মিলেছে। কন্নুর কার্যালয় থেকেই ৩০টি শক্তিশালী তাজা বোমা উদ্ধার হয়। পুন্নাদ অফিস থেকে ২০টি এবং ইরুটি অফিস থেকে আটটি স্টীলে মোড়া বোমা পাওয়া গেছে। পারদ এবং পানুর থেকে দেশি বোমাও উদ্ধার করেছে পুলিশ। পারদ এবং পানুর সিপিএম পরিচালিত (স্পনসরড্) হত্যার রাজনীতির এলাকা বলেই পরিচিত।

পায়ানুর, মানা, থালিপ্পারাম্বু, নারাথ, পাপ্পিনেসেরি, মানকাদাভু, থাজে, চোভা প্রভৃতি জায়গায় পপুলার ফ্রন্ট নেতাদের বাড়ি থেকে লোহার রড, ধারালো অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার হয়েছে। কন্নুর ছাড়া কোজিকোড় জেলার অন্ততঃপক্ষে পপুলার ফ্রন্ট নেতাদের পঁচিশটি বাড়ি ও কার্যালয়ে রেইড হয়। কোঝিকোড়ে শহরের পুলিশ কমিশনার পি বিজয়ন এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার সৌকথালির নেতৃত্বে পপুলার ফ্রন্টের প্রাদেশিক কার্যালয় 'ইউনিটি হাউস-এ' তল্লাশি অভিযান চলে। পুলিশ কমিশনারের বক্তব্য, প্রাপ্ত নথিপত্র পরীক্ষার পর মামলা দায়ের করা হবে। ইতিমধ্যেই কেরল হাইকোর্ট এক জনস্বার্থ মামলায় দু'সপ্তাহের মধ্যে রাজ্যকে পপুলার ফ্রন্ট এবং এস ডি পি আই সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্যসহ হলফনামা পেশ করতে বলেছেন।

১৯৯৩ সালে জনগণকে ক্ষেপিয়ে তোলা জেহাদ-পন্থী আব্দুল নাসের মাদানি ও তার নিষিদ্ধ ইসলামিক সেবক সঙ্ঘের (আই এস এস) মতো কট্টরপন্থী সংগঠনকে বাদ দিয়ে অপেক্ষাকৃত মডারেট রাজনৈতিক দল — পীপলস্ ডেমোক্রেটিক পার্টি গঠন করেন। ওই বছরই একইসঙ্গে তৃতীয় এক গোষ্ঠী সংগঠিত হয় প্রাক্তন সিমি (স্টুডেন্ট ইসলামিক মুভমেন্ট অফ্ ইন্ডিয়া) ক্যাডারদের নিয়ে। তার নাম হয়— ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট (এন ডি এফ)। ২০০৬-এ তাই 'পপুলার ফ্রন্ট অফ্ ইন্ডিয়া' নামে আত্মপ্রকাশ করে।

মাদানি এবং সুলেমান শেঠদের তুলনায় এন ডি এফ নেতারা নীরবে সন্তর্পণে চুপিসারে কাজ করত। এভাবেই তারা তৃণমূল স্তরে সংগঠনের জাল বিস্তার করে।

২০০৬ সালেই পূর্বতন এন ডি এফ থেকে অধুনা পপুলার ফ্রন্ট অফ্ ইন্ডিয়া তৈরি হলে কর্ণাটকের 'ফোরাম ফর ডিগনিটি' এবং তামিলনাড়ুর 'মনিথা নিথি পাসারিয়া' তাদের সঙ্গে যুক্ত হয়। পপুলার ফ্রন্টের ছাত্রশাখা এবং মহিলা শাখা খোলা হয়। ওই একই বছরে (২০০৬) পি এফ আই সংবাদমাধ্যমের জগতেও প্রবেশ করে। সংবাদপত্রের নাম—থেজস্ (Thejas)। মাদানির দল পীপলস্ ডেমোক্রেটিক পার্টি এক সময়ে পুরোপুরি মৌলবাদের প্রবক্তা ছিল, এখন মডারেট বলে দাবী করে। পপুলার ফ্রন্ট কার্যশৈলী এবং চারিত্রিক দিক থেকে মারকুটে এবং মতামতেও কট্টরপন্থী। কয়েকবছর আগেই 'পি এফ আই' তাদের কর্মপদ্ধতির পরিচয় দিয়েছিল এক আর এস এস কর্মীর হাত (৪ জুলাই এর মতো) একই পদ্ধতিতে কেটে নিয়ে। খৃস্টান অধ্যাপকের হাত কাটতে যারা এসেছিল তারা ১০০ কিমি দূরের ত্রিচুড় থেকে গাড়ি এনেছিল বলে জানা গেছে।

৪ জুলাই-এর ঘটনার পরই পুলিশ দু'জন পি এফ আই কর্মীকে গ্রেপ্তার করে— জাফর এবং আসরাফ। এরা দুজনেই সৌদি আরবে কাজ করত। তারা বারবার সৌদি আরবে যাতায়াত করেছে। পুলিশ জানতে চেষ্টা করছে— প্রাক্তন সিমি নেতা বসিরের সঙ্গে এদের কতটা যোগাযোগ ছিল। বসির ভারতের কাছে প্রত্যাশিত আসামী, জাফর, আশরফ-এর মতো বসিরও এর্নাকুলাম-এর বাসিন্দা। ৪ জুলাই-এর পর জনৈক 'কুনজুমন'-এর বাড়িতে একজন দুষ্কৃতী আশ্রয় নেয়। সেই বাড়িতেও রেইড হয়। 'কুনজুমন'কে আল কায়েদার এক ভিডিয়ো ফুটেজে দেখা গিয়েছিল।

পপুলার ফ্রন্ট-এর সাধারণ সম্পাদক আবদুল হামিদ-এর বক্তব্য বেশ জোরালো —"আমরা এমন এক সংগঠন যারা পুলিশী সক্রিয়তাকে চ্যালেঞ্জ করে এক বার্তা জানাতে চাই। পুলিশ অনেক সন্ত্রাসী কার্যকলাপে মুসলমানদের জড়াচ্ছে।"

২০০৫ থেকেই এই মুসলিম জেহাদি ক্যাডাররা সংঘ পরিবারকে টার্গেট করে। ২০০৫-এ আর এস এস-এর কন্নুর জেলা বৌদ্ধিক প্রমুখ টি অশ্বিনীকুমারকে চলতি বাসে হত্যা করেছিল মুসলিম দুষ্কৃতীরা। তিরুবনন্তপুরমের কিলিমান্নুর-এ রাস্তায় তাড়া করে হিন্দু কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতা এন সুশীল কুমারকেও হত্যা করা হয়েছিল। আরও দুজন আর এস এস কর্মীকে থিরুর শহরে মৌলবাদীরা হত্যা করেছিল। প্রকাশ্যে যাই হোক না কেন, "পপুলার ফ্রন্ট কিন্তু সিমি'র পদ্ধতিকেই অনুসরণ করে। যারা তাদের বিরোধিতা করে তাদেরকেই পি এফ আই টার্গেট করে" —একথা একজন গোয়েন্দা অফিসারের। মুসলমান সমাজ অনেকখানি মাস্‌ল পাওয়ার পি এফ আই-এর মাধ্যমে ব্যবহার করে। মুসলমানরা এখন আর কেরলে সি পি এম-এর উপর নির্ভরশীল নয়। দীর্ঘ সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বে বিদীর্ণ তালাসরিতে একসময় মুসলমানরা কম্যুনিস্টদের কাছে সংরক্ষণের জন্য দৌড়াত। নিজেদেরকে সংহত করার পর পি এফ আই এখন আর সি পি আই (এম)-এর তোয়াক্কা করে না। পি এফ আই মুসলমান ভাবাবেগকে কাজে লাগাচ্ছে বলে অভিযোগ সি পি এম নেতা পি. শ্রীরামকৃষ্ণণ-এর। পি এফ আই সম্পর্কে নরম অবস্থান নেওয়ার জন্য সিপিএম এবং মুসলিম লীগ একে অপরকে দোষারোপ করছে। বিগত

বিধানসভা নির্বাচনে বর্তমান রাজ্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কোদিয়ারি বালকৃষ্ণণ পপুলার ফ্রন্ট-এর কাছ থেকে দারুণ সমর্থন পেয়েছিলেন। এদিকে মাদানিকে সঙ্গে নিয়ে সভা করেছিলেন সিপিএম রাজ্য সম্পাদক পিনারাই বিজয়নও। শ্রীরামকৃষ্ণণ আরও বলেছেন, বিগত সংযুক্ত গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের রাজ্যের ক্ষমতায় থাকাকালীন মুসলিম লীগের কথায় পপুলার ফ্রন্টের বিরুদ্ধে ৩৬টি ফৌজদারী মামলা প্রত্যাহার করার জন্য পুলিশকে বলা হয়েছিল। পরবর্তীতে পপুলার ফ্রন্ট শক্তি সঞ্চয় করে মূর্তিমান বিভীষিকা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সোজা কথায় রক্ত নিয়ে খেলছে পি এফ আই। তারা পীড়িত মুসলমান, বিশেষ করে যারা বিভিন্ন মামলায় গ্রেপ্তার হয়েছে, মামলা চলছে তাদের রক্ষাকর্তার ভূমিকা নিয়েছে পি এফ আই। এছাড়া সরকারি চাকরিতে আরও বেশি সুযোগ গায়ের জোরে পাইয়ে দিতেও সচেষ্ট বলে অভিযোগ।

দলীয় মুখপত্র 'তেজস'-এর মাধ্যমেও তাদের নিজেদের মতবাদ প্রচারে সচেষ্ট। সেখানে কাশ্মীরী জঙ্গিদেরকে যোদ্ধা বলে উল্লেখ করা হচ্ছে। ওই পত্রিকায় নাটকীয়ভাবে পুলিশী অত্যাচারের ঘটনা, মানবাধিকার লঙ্ঘন, ভুয়ো এনকাউন্টারের ঘটনা, পশ্চিমী বিরোধিতার কথা 'স্টোরি' তৈরি করে পরিবেশন করা হয়, এছাড়া দলিত ও ব্যাকওয়ার্ডদের জন্য কুম্ভীরাশ্রু বর্ষণ তো আছেই। মালয়ালম্ ভাষার দৈনিকের পঞ্চম স্থানে গত পাঁচ বছরে ওঠে এসেছে 'থেজস্'। পরোক্ষভাবে মুসলিম-দলিত জোটগড়ার প্রয়াসও দেখা গেছে। সেজন্য গত বছর পি এফ আই-র চেষ্টায় 'সোসাল ডেমোক্রেটিক পার্টি অফ্ ইন্ডিয়া' নামে একটি দল গড়ে তার নেতৃত্বে পশ্চাৎপদ শ্রেণীর হিন্দুদের বসিয়ে দলিত— ইসলাম ইস্যুকে চাঙ্গা করার অপচেষ্টাও লক্ষ্য করা গেছে। দল 'কন্নুর' আসনে গতবছর কংগ্রেস প্রার্থী এ পি আবদুল্লাকুট্টির বিরুদ্ধে প্রার্থী দাঁড় করিয়ে মাত্র ৩০০০ ভোট পায়।

তবে মাদানির বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের অভিযোগ ওঠায় আপাতত ব্যাকফুটে। বাঙ্গালোরে সন্ত্রাসী আক্রমণের ঘটনায় এবার মাদানির নাম সামনে এসেছে। যে কোনও সময় গ্রেপ্তার হতে পারেন মাদানি। এখানে উল্লেখযোগ্য— দীর্ঘ অনুসন্ধানের পর কোয়েম্বাটুরে বিজেপি নেতা এল কে আদবানীর সভায় বিস্ফোরণের ঘটনায় মাদানি ধরা পড়ে তামিলনাড়ুর জেলে ছিলেন।

গত বিধানসভা নির্বাচনের আগে সাজাপ্রাপ্ত মাদানিকে প্যারোলে চিকিৎসার নাম করে ছাড়িয়ে কেরলে নিয়ে যাওয়া হয়। এক্ষেত্রে কংগ্রেস ও বামপন্থীরা প্রতিযোগিতায় নেমেছিল। সেই থেকেই মাদানি কেরলে ছড়ি ঘোরাচ্ছে। একবার প্রতি আক্রমণের মুখে পড়ে মাদানির চলার ক্ষমতা হারিয়ে গেছে দীর্ঘদিন আগেই। হুইল চেয়ারে করেই মাদানি কেরলে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। সন্ত্রাসী জেহাদিরা রাজনৈতিক মদত পেলে কী হয় বা হতে পারে তার নমুনা আগেও ছিল। সর্বশেষ উদাহরণ নিউম্যান কলেজের অধ্যাপক টি জি যোসেফ এর হাত কেটে নেওয়া। পশ্চিমবঙ্গের ডান-বাম কেউই এ নিয়ে রা কাড়েনি। গুজরাটের বাইরে কোনও সন্ত্রাসই যেন তাদের কাছে সন্ত্রাস নয়।

মাদানির পাশে সি পি এমের কেরল রাজ্য সম্পাদক পি বিজয়ন।

প্রকাশিত হবে ২ আগষ্ট '১০ স্বস্তিকা প্রকাশিত হবে ২ আগষ্ট '১০

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

আগামী ২ আগষ্ট সার্ধশতবর্ষ জন্মদিবসে পদার্পণ করছেন বাঙালীর বিজ্ঞান সাধনার অন্যতম পথিকৃৎ তথা নবজাগরণের অন্যতম রূপকার আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়। 'হিন্দু কেমিস্ট্রি'র রচয়িতা প্রফুল্ল চন্দ্রের বিজ্ঞান সাধনা ও স্বদেশী শিল্পভাবনার প্রতি স্বস্তিকা-র বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি 'আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় স্মারক সংখ্যা, ২০১০'। তথ্যপূর্ণ ও মননশীল রচনায় সমৃদ্ধ পত্রিকাটি নিঃসন্দেহে সংরক্ষণযোগ্য।

।। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হচ্ছে।। দাম ঃ চার টাকা।।
সত্বর কপি বুক করুন।

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩ কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।
সম্পাদক ঃ বিজয় আঢ্য, সহ সম্পাদক ঃ বাসুদেব পাল ও নবকুমার ভট্টাচার্য। দূরভাষ ঃ সম্পাদকীয় - ৯৮৭৪০৮০৩৪৩, অফিস - ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১, বিজ্ঞাপন - ৯৮৭৪০৮০৩৪২, ২২৪১-০৬০৩, টেলিফ্যাক্স ঃ ২২৪১-৫৯১৫,
e-mail : swastika5915@bsnl.in / vijoy.adya@gmail.com, website : www.eswastika.com